CHEIRO'S ALLOUKICK GALPA

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৬

প্রকাশিকা : বুলবুল মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : শ্রীগোপাল চন্দ্র পাল : স্টার প্রিন্টিং প্রেস

২১/এ, রাধানাথ বোস লেন : কলিকাতা-৬

খ্রীষ্টাব্দ ১০০, হেস্টিংসের যুদ্ধ জিতে যে নর্মান বীর ইংলণ্ডের দখল নিলেন তাঁর নাম, উইলিয়াম দ্য কঙ্করার।

যুদ্ধ-জয়ে সহায়তার জন্যে তার কাকার ভাগ্যে জুটল ছ'টা কাউণ্টির জমিদারী আর জমকালো খেতাব প্রিন্স অব্ গ্রামরগানশায়ার।

প্রাচীন এই নর্মান বংশে লুই হ্যামনের জন্ম। ছদ্মনামে কিরো আর এই নামেই তার জগৎ-জোড়া খ্যাতি।

লুই হ্যামনের মা ছিলেন গ্রীক দেশীয়া। হাত ও হাতের রেখা সম্পর্কে তার বিশেষ কৌতূহল ও প্রবণতা ছিল। এ সম্পর্কে দুষ্প্রাপ্য কিছু পুঁথি-পত্তরও তার সংগ্রহে ছিল। তার বিশেষ ইচ্ছেই ছেলেকে এ ব্যাপারে কৌতূহলী করে তোলে। বলা যায় মায়ের কাছেই লুই হ্যামনের দীক্ষা। পরে তার জীবনব্যাপী সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফলে দুর্গম এই বিদ্যায় অপৌরুষেয় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

নর্মান ঐতিহ্যে লালিত পিতা সম্ভ্রান্ত হ্যামন পরিবারের ছেলের পক্ষে হাত-দেখা জীবিকা হিসেবে সম্মানের বলে মানতে চান নি। হয়তো তার অভিজাত রুচি কোন সম্ভ্রমাক্ত সুকুমার আশ্রয় প্রত্যাশা করেছিলেন। লুই হ্যামন কিন্তু সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সরিয়ে দৃঢ় পায় নিজের সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে গেছিলেন।

Cheiro শব্দটা তার স্বপ্নে পাওয়া। হাত অর্থমূলক গ্রীক শব্দ Cheir থেকে এসেছে।

বিন্যস্ত করতলের আঁকা-বাঁকা রেখার বিচিত্র বিস্তারের অন্তরালে মানব জীবনের ভাঙা-গড়ার যে-কাহিনী ছড়িয়ে আছে তাকে অনায়াসে ব্যক্ত করেছেন কিরো। স্বতোৎসারিত সেই কথন অবারিত ভাবে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। মানতেই হবে অলৌকিক সেই ক্ষমতা!

অধ্যাত্ম সাধনার গূঢ় তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে বেশ কিছুকাল প্রাচীন ভূমি ভারতবর্ষে ছিলেন। এই সময় তার সাধুসঙ্গ হয়।

কিরো সুপ্রাচীন এই লুপ্ত-বিদ্যাকে ভূত-প্রেত ও ডাইনী বিদ্যার কুহক-ছলনা থেকে উদ্ধার করে অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছেন।

জীবিকার প্রয়োজনে দুই মহাদেশের তিন রাজধানী নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন ও প্যারিসে যাযাবর পাখির মতো উড়ে বেড়িয়েছেন। ফলে নানান জাতের নানান মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে। তাদের মধ্যে আর্ল-ব্যারন

ডিউক-মিলিওনার-প্রিন্সেস-ডাচেস থেকে সাধারণ মানুষের ছড়াছড়ি। তাদের সম্পর্কে কিরোর সহৃদয়তার অন্ত নেই। তাদের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত করেছেন। সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। শত্রু ভাবাপন্ন মানুষের প্রতিও তিনি বিদ্বেষহীন।

তার অবিস্মরণীয় ভবিষ্যদ্বাণীর কয়েকটি তো মানুষের স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে।

ধরা যাক না অস্কার ওয়াইল্ডের কথা।

সেই-যে লম্বাটে ধরনের আইরিশ যুবক—গুটিকয়েক গল্প আর খান কয়েক উপন্যাস লিখে ইংরিজি সাহিত্যের খাতায় নাম পাকা করে রেখেছেন। কে না জানে, তার রূপসী কাহিনীর মধ্যে কতো অজস্র শব্দের হীরে-চুনি পান্না ছড়িয়ে চমকে দিয়েছিলেন সবাইকে।

সেই অস্কার ওয়াইল্ডের সঙ্গে কিরোর এক আসরে দেখা।

কৌতূহলী অস্কার ওয়াইল্ড কিরোর সামনে নিজের হাত মেলে দিলেন।

হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিলেন কিরো। গভীর মনোযোগ দিয়ে ছড়ানো কর-রেখায় চোখ মেলে ডুবে গেলেন। কতক্ষণ পরে মাথা তুলে মৃদু কণ্ঠে বললেন, বছর সাতেক পরে সৌভাগ্য আপনাকে ছেড়ে যাবে।

অস্কার ওয়াইল্ডের সৌভাগ্য তখন খ্যাতির দুর্গশিখরে পতপত করে উড়ছে। কিরোকে বিশ্বাস করেন নি অস্কার ওয়াইল্ড।

আমরা জানি, ভাগাহত অস্কার ওয়াইল্ডকে অপ্রত্যাশিত কলঙ্ক কি ভাবে দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, কারাবাস আর নিঃসঙ্গ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

তারপর মনে পড়ছে মহামতি স্টেডের কথা। কিরো তাকে দুবার সতর্ক করে বলেছিলেন, জল থেকে সাবধান থাকবেন। বারো বছর আগে একবার বারো বছর পরেও আরেকবার।

চলমান প্রমোদ তরণী টাইটানিক ইংলণ্ডের উপকূল থেকে সাগর পেরিয়ে আরেক মহাদেশের উপকূলে পৌছবে। সেই জাহাজে যাত্রী হলেন মহামতি স্টেড। চিরকাল ভেসে চলবার মতো অক্ষয় তার অবয়ব টাইটানিকের। তবু মাঝরাত্রের অসতর্ক প্রহরে ভাসমান বরফের পাহাড়ের ধাক্কা খেল আর আটলান্টিকের হিংস্র নোনা জল তাকে গিলে ফেলল।

কিরোর আরেকটি ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বানী না বললেই নয়:

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাশিয়া গেছিলেন কিরো। বিশাল দেশ। গর্বিত নৃপতি। দর্পিত তার শাসন। কিরোর খ্যাতি তখন আটলান্টিকের দুপারে দুই মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিরোর রাশিয়ায় অবস্থিতির খবর জানতে পেরে জার গোপনে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

কিরোর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল: আসন্ন এক উপপ্লবে তিনি এবং তার বংশের প্রায় সবাই নিহত হবেন।

না, কিরো এসব মানুষদের নিয়ে গল্প লিখতে চাননি। তার সে রকম ইচ্ছেও ছিল না। তবু বহুজনের জীবনের বহু সমস্যার মুখোমুখি হয়ে অভাবনীয় অভিনবত্বে চমকে উঠেছেন আর সে-সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সত্য ঘটনা এখানে বলেছেন।

ছোট গল্প লেখার দায় তার নেই। সাহিত্য সৃষ্টিও তিনি করতে চাননি। তবু নিটোল পরিসরে জীবনের প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সত্যকে প্রত্যক্ষ করার অলৌকিক ক্ষমতা আমাদের বিস্ময়কে বিপন্ন করে তোলে। নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ এক সম্পৃক্ত দার্শনিকতায় উদ্ভাসিত তার চোখের আলোয় জীবনের অসহায় যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করে বিমূঢ় হই।

সমস্ত কাহিনীর নায়ক ভাগ্য। জীবনের উপত্যকায় ভাগ্য সকৌতুকে ইচ্ছে মতো তার হাতের তাস ছুঁড়ে দিচ্ছে; আর সে তাস তুরুপের।

মনে হয় লক্ষ্য কিংবা উপলক্ষের নায়কের কাছে আমাদের উচ্চারিত জিজ্ঞাসা, যুক্তি-তর্ক ও প্রত্যাশা অনর্থ।

অনুবাদ আমার বিষয় নয় তবু জীবনের অনাস্বাদিত এক আনন্দ পাঠক ও পাঠিকারা পাবেন এই আশায় তুলে ধরলাম।

ভালো লাগলে সার্থক হব। কৃতার্থ হব। পরিশেষে বলি, অনুবাদ কন্থাদার কাশ্মিরী শালের উলটো পিঠ এ কথাটা মনে রাখলে খুশি হব।

লেখকের অন্যান্য বই

নাঙ্গা তলোয়ার

নীলডুংরী

সঙ্গী তিনজন

নরখাদকের দেশ

বনভূমির গান

অপরিচিত অন্ধকারে (দুইপর্ব

পাপ

রূপসী অন্ধকার

কামনার রঙ

অন্য নাম নরক

লগ্ন গোধূলির পালা

সোনালি রূপোলি মাছ

সূচীপত্র



লেডী ওয়েদারবীর প্রেমিক

জেনারেল স্যার হেনরী ওয়েদারবীর সঙ্গে লেডী ওয়েদারবীরের,যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়েস আঠারো। স্যার ওয়েদারবী তার স্ত্রীর চেয়ে কুড়ি বছর বড়। একজন বিশিষ্ট সেনানায়ক ছিলেন তিনি। ঠিক এই সময় তাকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিককার একটা প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়েছিল।

বিয়ের পর হ্যানোভার স্কোয়্যারের সেন্ট জর্জ গীর্জার সিঁড়িতে পাতা লাল কার্পেটে পা ফেলে ত্বজনে যখন বেরিয়ে এলেন উপস্থিত সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিলেন, কী চমৎকার জোড় মিলেছে !

নব-দম্পতির ওপর চাল ছড়িয়ে, ছেঁড়া জুতো ছুড়ে ও অন্যান্য প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে তাদের অভিনন্দিত করা হয়েছিল।

বিয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নব-দম্পতি ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। সেখানে স্যার ওয়েদারবীকে গভর্ণরের কার্যভার নিতে হবে এবং গভর্ণরের স্ত্রী হিসেবে লেডী ওয়েদারবীকে সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে হবে।

লেডী ওয়েদারবী যেদেশে তিনি যাচ্ছেন সেদেশ সম্পর্কে তার বিশেষ কিছু জানা ছিল না। কেবল জানতেন, সেখানে তিনি জন্মেছিলেন আর তারপ্রয়াত পিতা লর্ড মিডেনটন যে-প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন তার স্বামীও সেই প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছেন। লর্ড ও লেডী মিডেনটনের একমাত্র সন্তান হিসেবে অত্যন্ত গোঁড়া নিয়ম-কানুনের মধ্যে তাকে মানুষ করা হয়েছিল। তাদের বাড়িতে অতি প্রাকৃত বিষয়, প্রেতাত্মার আবির্ভাব, আধ্যাত্মিক অথবা জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে যে-কোন রকম আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল। মাননীয়া ডরোথী মিডেনটনকে যে-ভাবে জগৎ-সংসার থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল কোন মঠের সন্ন্যাসিনীকেও বোধহয় তেমন করে রাখা হয় না।

চোদ্দ-বছর বয়সে তার মা মারা যান। বাবাও ছ'মাসের বেশি অপেক্ষা করতে পারেন নি। তিনি একজন প্রাক্তন কোরাস গায়িকাকে বিয়ে করেন।

ডরোথীকে লণ্ডনে তার চিরকুমারী পিসিমার কাছে পাঠান হল। ভদ্রমহিলা ছিলেন ধর্মের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। সব সময় বাড়ির সামনের দিককার ঘরের জানালা বন্ধ করে রাখতেন পাছে পথ-চলতি মানুষের ছায়া তার ভাইঝির চোখে পড়ে। তবু ভাগ্যের এমনই লীলা। সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও একদিন ডরোথী ফুল হয়ে ফুটে উঠল আর চার্চ বাজারে যাবার পথে লণ্ডনের সব চেয়ে কাঙ্ক্ষিত পুরুষ জেনারেল স্যার হেনরী ওয়েদারবীর সঙ্গে বিশেষ মুহূর্তে দেখা হল।

চিরকুমারী পিসি নিজের হাত থেকে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার এমন সুযোগ দেখে পুলকিত হয়ে উঠলেন। পিসি ইতিমধ্যে নজর করেছিলেন, ভাইঝি দোকানে-বাজারে কেনাকাটা করতে গেলে পুরুষের দল কী ভাবে লুব্ধবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে থাকে!

শহরের জাঁকালো সাজসজ্জা আর ফ্যাশনের মাঝখানে ডরোথীর পোশাকের সরল পারিপাট্যর এবং ঋজু ও কৃশকোমল অবয়বের আকর্ষণীয় লাবণ্য অসাধারণ বৈপরীত্য নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠত।

পিসি চার্চবাজার থেকে ডরোথীর জন্যে শাদা মসলিন কিনতেন। শুভ্র মসলিন দিয়ে তার জন্যে সাদা-মাঠা পোশাক তৈরি হত। শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলা ডরোথীকে তার চুলে শাদা গোলাপ ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। এর বেশি কিছু নয়।

মানুষের ধরনটা একটু বিচিত্র! তারা সেই সব জিনিষই পছন্দ করে যার মধ্যে বৈপরীত্যের সন্ধান পায়। রঙ করা মুখ আর ঠোঁট হয়তো উন্মাদনার সময় ভালো লাগে কিন্তু এমন লোক খুব কমই আছেন যারা ব্রেকফাস্ট টেবিলে, লাঞ্চ অথবা ডিনারের সময় তাদের প্রত্যাশা করেন!

স্যার হেনরী ওয়েদারবীও এই সাধারণ নিয়মের আওতার বাইরে পড়েন না। অর্ধেক ইউরোপের প্রাঙ্গন ঘুরে অনেক রঙ করা মুখের মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল আর তাদের কাউকে-কাউকে হয়তো ভালোও বেসেছিলেন কিন্তু তাদের কাছ থেকে তার ভাগ্যে জুটেছিল শুধু প্রবঞ্চনা, দাহ আর দুঃখ। অবশেষে ডরোথীর মধ্যে খুঁজে পেলেন তার স্বপ্নকে—নিষ্পাপ শুভ্রতার শরীরী রূপ!

স্যার হেনরী ওয়েদারবী দ্রুত সিদ্ধান্তের অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি নিজেই পিসিকে রাজি করালেন। এমন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে তোষামুদে কথা শুনে পিসি তো ভারি খুশি! তাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে বসলেন।

গভর্ণরের কাজ নিয়ে শিগ্রি ভারতবর্ষে যেতে হবে সেইজন্যে স্যার হেনরী ওয়েদারবী তার মনের কথা জানাতে দেরি করলেন না। হ্যানোভার স্কোয়ারের সেন্ট জর্জেস গীর্জাতে বিয়ের আয়োজন করা হল।

কয়েক বছর বাদে লেডী ওয়েদারবী ভারত থেকে লণ্ডনে ফিরলে তার সঙ্গে আমার আলাপ হল। তার নিজের পরিচয় না দিয়ে আমার সেক্রেটারীর সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

মে মাসের সেই অপরাহ্নের কথা আমি কখনো ভুলব না; সেদিন থেকে তার সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্বের সূচনা হয়েছিল মৃত্যু পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ ছিল।

প্রথম দর্শনেই তার শরীরের আশ্চর্য গঠন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল। তাকে বললাম, আপনার বিয়েটা সুখের হয়নি আর শিগ্রি বিচ্ছেদ ঘটে যাবে।

সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকালেন লেডী ওয়েদারবী, তা বোধহয় হবে না। আমার স্বামী কি করে আমাকে ডাইভোর্স করবেন। আমি তো আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো নই—আমার প্রেমিক নেই—কখনো থাকবেও না। পুরুষ সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই, তারাও কখনো আমার কাছে প্রণয় নিবেদন করে না। তারপর হঠাৎ তিনি বললেন, কিরো আপনি কি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন? ভারতবর্ষে গিয়ে এ ব্যাপারে আমি যা জানতে পেরেছি তা আমাকে গভীর ভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। আগে আপনি বলুন, আপনি কি মনে করেন তারপর আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলব।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি আমাকে ছেয়ে ফেলল। তার হাত থেকে চোখ তুলে তাকালাম। চোখে চোখ পড়ল। বুঝতে পারলাম, এমন একজন মহিলা আমার সামনে রয়েছেন সেক্সের দিক থেকে যিনি কিছু-

মাত্র স্বাভাবিক নন। মনে মনে ভাবলাম, এ ব্যাপারে আমি কি তাকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করতে পারি! মনে হল পারি।

হ্যাঁ। আমি উত্তর দিলাম, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করি। আর এ ব্যাপারে আমার নিজের অদ্ভুত একটা মত আছে। মনে রাখবেন সে-সব কেবল তত্ত্ব, গভীর কোন চিন্তা-ভাবনার বিষয় নয়।

আমার মনে হয়। লেডী ওয়েদারবী হাসলেন, আপনি নিশ্চয়ই অন্যান্য অনেক জন্মান্তরবাদীদের মতো, কারো মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখলে বলবেন না যে সে মিশরের রাজা কিম্বা রাণী ছিল অথবা গ্রীসের কোন মন্দিরে উৎসর্গিতা চিরকুমারী ছিল। যে কুৎসিত মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আগের জন্মে সে সম্ভবত ছিল ক্লিওপেট্রা! যে লোকই তাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করত—তার চোখে ছিল মার্ক এ্যাণ্টনী— !

না না। আমি বললাম, এ সব আমিও বিশ্বাস করি না। আপনি আমার তত্ত্বকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে ভাববেন না। আমার বিশ্বাস এইটুকু বলে আমি তাড়াতাড়ি বলে গেলাম, নিচুস্তরের প্রাণীরা সব সময়ই চেষ্টা করছে উঁচুস্তরে উঠে আসার আর তাদের এই চেষ্টা নতুন করে দেহ ধারণের ভেতর দিয়েই সেই সুযোগ পায়। হয় মানুষের শরীরের ভেতর দিয়ে কিম্বা বিবর্তনের এই ধারা কেবল মানবজাতির প্রতিই প্রযোজ্য নয়, তার ভূমিকা মানবেতর যে কোন শরীরী প্রকৃতির মধ্যে সমান ভাবে সক্রিয়।

মনে হল, আমার তত্ত্ব লেডী ওয়েদারবীকে প্রভাবিত করেছে। তার নিমীলিত চোখে একটা জিজ্ঞাসা অপলক হয়ে উঠেছিল।

অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি অবশ্য বলতে পারি না আপনার তত্ত্ব আমার বেলায় কতখানি খাটবে যদি পারেন তো বলুন না আমি কতো জন্মের ভেতর দিয়ে এসেছি?

আমি জানি ভাবাবেগে উত্তর দেবার জন্যে আমার সমালোচনা হতে পারে। অদ্ভুত গড়নের এই মহিলার সামনে বিচারকের আসনে বসবার অধিকার আমার নেই। তবে এও মনে হয় তাকে প্রবঞ্চনা করা ন্যায় নীতির দিক থেকে আরো অসমীচীন।

যে-সব ভাবনা আমার মনের মধ্যে ব্যাকুল হয়ে চাপ দিচ্ছিল তাদের বেশিক্ষণ আটকানো গেল না।

আমি বললাম, আপনি স্বাভাবিক মহিলা নন। সত্যি কথা বলতে কী, আপনি মানুষই নন! কারণ, আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন, কেউ আপনাকে ভালোবাসেনি আপনিও কাউকে ভালোবাসতে পারেন নি। আপনি পুরুষকে সৌন্দর্য দিয়ে টানতে পারেন কিন্তু তাদের দেবার মতো কিছুই আপনার নেই। আপনি বলেছেন আপনার স্বামী এমন এক পুরুষ—যিনি যে কোন নারীর কাম্য ; কিন্তু আপনি তার ভালোবাসায় সাড়া দেননি কখনো আর আপনাদের বিয়ে সার্থক হয়ে ওঠেনি।

আপনি জীবনের নিম্নতম অভিব্যক্তি থেকে আপনার বর্তমান প্রতিরূপ—যা এই ধরনের প্রতিরূপের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ধরনের বলে মনে হয়—যে সব জন্ম আপনি পার হয়ে এসেছেন। তা কোন মানুষের নয় এমন কি কোন জন্তুরও নয়!

আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। লেডী ওয়েদারবী আমার কথার মাঝখানে বাধা দিলেন, আমি এখন আপনাকে ভারতবর্ষে আমার যে অভিজ্ঞতার কথা বলতে যাচ্ছি তা আপনার বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আমার স্বামী আশ্চর্য রকমের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন পুরুষ কিন্তু আমি তার মন ভেঙে দিয়েছি—আমি কখনো কোন ভাবে তার জীবনে ঠাঁই করে নিতে পারিনি অথবা তার উচ্চাভিলাষের ব্যাপারেও কোন সাহায্য করতে পারিনি। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা সম্পর্কে কী রকম একটা ঘৃণা আমার ছিল আর সে কথা আমি খোলাখুলি বলতাম।

আমার স্বামী কখনো বকাবকি করেছেন ; তবে সব সময়ই তিনি আমার প্রতি সহৃদয় ছিলেন। তবু বছরের পর বছর আমরা দূরে সরে যেতে লাগলাম।

আমার একলা বেড়াতে ইচ্ছে করত—পারলে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম। বুনো জন্তু বা সাপের ভয় আমার ছিল না। সাপকে আমার সব সময়ই ভালো লাগত।

এই রকম একদিন বেড়াতে বেরিয়ে—এমন একটা পথ দিয়ে এগিয়ে গেলাম যে পথটা একটা ভাঙা-চোরা মন্দিরের সামনে গিয়ে থেমেছে। এ রকম মন্দির ভারতবর্ষের সব জায়গায় দেখা যায়। প্রথমে নিজেকে একলা ভেবেছিলাম। পরে দেখলাম, সেখানে একজন যোগী থাকেন। ইনি সেই সব ত্রিকালদর্শী ঋষিদের একজন যাদের শুধু মাত্র সেই রহস্য-ময়দেশ ভারতবর্ষে দেখা যায়। তিনি এমনভাবে আমাকে সম্ভাষণ করলেন যেন তার আমি আজন্ম পরিচিত! পথ দেখিয়ে গুহার ভিতরে নিয়ে গেলেন! সেখানে আমরা বুদ্ধদেবের বৃহদাকার মূর্তির ছায়ায় পাশাপাশি বসলাম।

যোগী জিজ্ঞাসা করলেন, বৎসে তোমার কি কিছু জানবার আছে?

তা তো আমি জানি না। আমি উত্তর দিলাম, তবে হঠাৎ এখানে এসে আমি আমার জীবনের পথ পেয়ে গেছি।

যোগী হাসলেন, হঠাৎ বলে কিছু নেই। কোন একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তোমাকে এখানে আসতে হয়েছে। বলো তো তোমার মনের দুঃখটা কী?

আমি বোকার মতো বলে ফেললাম, এই ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন তো—অন্য সব মেয়েদের থেকে আমি আলাদা কেন?

আজ আপনি যে ভাবে বললেন সেই একই ভাবে তিনিও বললেন, তুমি তো মানুষ নও। তোমার আত্মা এখনো সেই স্তরে পৌঁছতে পারেনি। তারপর তিনি বলে চললেন, বৎসে আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ—তোমার বাবা এই প্রদেশের গভর্ণর হয়ে আসবার আগে থেকেই এখানে আছি। মনে হয় যেন কালকের ব্যাপার। তোমার জন্ম তোমার মা-বাবার মনে বিপর্যয় এনেছিল। তারা প্রত্যাশা করে-ছিলেন একটি ছেলে। হল একটি মেয়ে।

তোমার সম্বন্ধে অদ্ভুত কিছু ঘটনা তখনো ঘটতে বাকি ছিল। একদিন বিকেলে, তোমার বয়েস তখন অল্প কয়েকটা মাস; তোমার আয়া তোমাকে মায়ের ঘরের বাইরে বারান্দায় ছোট খাটের ওপর একলা রেখে গেছিল। ফিরে এসে সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

দেখে, প্রকাণ্ড একটা শঙ্খচূড় সাপ খাটের চারপাশ জড়িয়ে ফণাটা তোমার বালিশে রেখেছে।

তোমার বাবা ছুটে এলেন। তিনি বা চাকর-বাকররা কিছু করবার আগে শঙ্খচূড় সাপটা বারান্দার নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেইদিন থেকে তোমার আর সাপের ভয় রইল না।

এই ঘটনা তোমার মাকে এত বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল যে তোমার বাবা পদত্যাগ করে তোমাকে নিয়ে ইংলণ্ডে না ফেরা পর্যন্ত তিনি শান্তি পাননি।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল, কুড়িবছর বাদে তোমার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে তোমার জন্মস্থানে ফিরে এলে—তিনি ও আবার সেই একই পদে চাকরি নিয়ে এলেন।

আমি কি তাহলে সাপের জন্মান্তর গ্রহণ করেছি? যোগীকে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি একটু ইতস্তত করে আমার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ। ঠিক তাই। তুমি যে অন্য মেয়েদের চেয়ে আলাদা ধরনের তার রহস্য বোধহয় এইখানে।

সেইদিন সন্ধ্যায়, স্নান সেরে যখন ডিনারের জন্যে সাজসজ্জা করছিলাম, হঠাৎ আয়নায় আমার চেহারা চোখে পড়ল। এই প্রথম লক্ষ্য করলাম, আমার শরীরের গঠন আর দশটা মেয়ের যেমন হয়ে থাকে তেমন নয়। আমার শরীর কোমল নমনীয় আর যুগ্ম গ্রন্থি যুক্ত। আমার বুকে স্তন এবং নিতম্বও নেই। যখন আমি দু'পা একসঙ্গে করে দাঁড়ালাম তখন আমি যেন দেখতে সাপের আকৃতি পেলাম!

গায়ের রঙ আমার উজ্জ্বল শাদা। মনে পড়ল, প্রত্যেক বছর আমার গায়ের চামড়া উঠে যায় আর নতুন চামড়া গজায়। আমি বইয়ে পড়েছি, এরকম ব্যাপার সাপের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে বিশেষ করে গোখরো আর কেউটে সাপের বেলায়।

তারপর আমি যখন আয়নার কাছাকাছি গিয়ে ভালো করে

দেখলাম, স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আমার কপালে তিনটে রেখা—ঠিক যেমন শঙ্খচূড় সাপের মাথায় থাকে !

আমি যোগীর কথায় দুঃখ পাইনি বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হইনি। এবার বুঝতে পারলাম, কেন আমি অন্য মেয়েদের চেয়ে আলাদা। এই সত্যটুকু উপলব্ধি করে আমি আগের চেয়ে সুখী হলাম।

পরের দিন দুপুরে আমি আবার মন্দিরের পথ ধরে সেই প্রাচীন মানুষটির কাছে গেলাম। তার একটা আশ্চর্য জীবন দর্শন ছিল যা দিয়ে জীবনের অনেক রহস্যই সহজ করে দিতেন। আমি ঠিক করলাম সপ্তাহে অন্তত একবার তার কাছে গিয়ে তার কাছ থেকে উপদেশ নেব।

এই রকম একদিন তার কাছে গেছি, এমন সময় কাছাকাছি জঙ্গল থেকে দশাসই চেহারার একটা পুরুষ শঙ্খচূড় সাপ উঠে এসে পাথরের মেজে পার হয়ে আমার পায়ের ওপর মাথা রাখল।

আমি কিন্তু মোটেই ভয় পাইনি। বুঝতে পেরেছিলাম, এ আমার কোন ক্ষতি করবে না। আমি ঝুঁকে পড়ে তার ফণার ওপর মৃদু চাপড় দিতে লাগলাম। সেইদিন থেকে যখনই আমি মন্দিরে যেতাম সেই সাপটা নিঃশব্দে এসে আমার পায়ের ওপর মাথা রাখত।

আমি তার নাম রাখলাম, বব্। শিগ্গি সে নাম রাখার ব্যাপারটা বুঝতে পারল আর নাম ধরে ডাকলেই খুব কাছে চলে আসত।

মাসের পর মাস পার হয়ে যেতে লাগল আমি ক্রমশ যোগীর উপদেশের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগলাম; গভর্ণরের স্ত্রী হিসেবেও আমার সামাজিক কর্তব্যে অবহেলা করতে লাগলাম। শেষে আমি এমন একটা জায়গায় গিয়ে হাজির হলাম যেখান থেকে আমার পক্ষে রুটিন অনুযায়ী রোজ নৈশভোজের হাজির থাকা কোন সম্বর্দ্ধনা সভায় কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বা দাতব্য কার্যক্রমে যোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

অনুভব করলাম, ফাঁকা-মাথা গবেটের দল যারা ফ্যাশান দুরস্ত হয়ে আসে—কিংবা সেই সব পুরুষ যারা সোনা দিয়ে কারুকার্য করা ঝকঝকে পোশাকে মোড়া তাদের সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। আমার স্বামী

আমার ব্যবহারে বারবার প্রতিবাদ করলেন। আমিও বারবার চেষ্টা করতে লাগলাম তার ইচ্ছে মতো কাজ করার জন্যে—কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতে লাগল। আমার ভাবনা জুড়ে রইল সেই ভাঙাচোরা হিন্দু মন্দির আর শঙ্খচূড় সাপের কথা যে আমার পায়ে এসে মাথা ঠেকায়।

একদিন অপরাহ্ণে যোগী হঠাৎ বলে বসলেন, তোমার ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার সময় এসে গেছে।

আমি বললাম, অসম্ভব! আমরা মাত্তর চার বছর এখানে এসেছি। আমার স্বামী তার রাজনৈতিক উচ্চাশা কখনো মুলতুবী রাখবেন না। তাছাড়া হালফিল তিনি আমার সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিতৃষ্ণায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এমন কি যখন আমি এসব ব্যাপারে যোগ দেবার অনিচ্ছের কথা জানিয়ে আমার ঘরে থাকতে চাই তখনো তিনি কোন প্রতিবাদ করেন না।

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বললেন, বৎসে তোমার ধারণা ভুল। এই পৃথিবী ও তার সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই। গভর্ণর তার পদে শিগ্রি ইস্তফা দেবার কথা ঘোষণা করবেন। আমি তোমাকে ষ্টীমারের ওপর দেখতে পাচ্ছি—তুমি দেশে ফিরে যাচ্ছ।

কিন্তু আমি আমার বব্‌কে ছেড়ে যাব কি করে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

তাকে ছেড়ে যেতে হবে না। তিনি জবাব দিলেন, তুমি তাকে সঙ্গে করে লণ্ডনে নিয়ে যাবে। তোমার ভাগ্যের সঙ্গে সে জড়িয়ে গেছে; এমন কি যদি সে তোমার সর্বনাশের কারণও হয়।

কয়েক সপ্তাহ বাদে, একদিন সকালে আমার স্বামী ব্রেকফাস্টের সময় বললেন, তিনি তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন—আর সম্ভবত পি এ্যাণ্ড ও কোম্পানীর পরের জাহাজে বোম্বে থেকে আমরা ফিরে যাচ্ছি।

তুমি বোধহয় হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছ? স্বামীকে প্রশ্ন করলাম।

মোটেই না। তিনি জবাব দিলেন, গত কয়েকমাস ধরে এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি।

সেদিন দুপুরের পর মন্দিরে গিয়ে দেখলাম যোগী বব্‌কে নিয়ে যাবার জন্যে একটা বাস্কেট বানিয়েছেন—আর সাপটা তার মধ্যেই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে—যেন যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে।

এক সপ্তাহ পরে আমরা জাহাজে চড়লাম। আমার স্বামী দুটো কেবিনের ব্যবস্থা করেছিলেন। যেমন ইংলণ্ড থেকে আসবার সময়ও করেছিলেন। পার্থক্য শুধু এই যে আগেকার মতো দুটোর মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না।

আমি কোচের ওপর বাস্কেটটা দেখতে পেলাম। তালা লাগানো। চাবিটা আমার নাম লেখা একটা খামের মধ্যে ছিল।

বাস্কেট খুলতেই বব্‌ তার মাথা বের করে আমার হাতের তালুতে ফণাটা আলতো করে ঘসতে লাগল আর মৃদু ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে থাকল—খুশি হলে সে এই ধরনের শব্দ করত।

আমার স্বামী কখনো আমার ঘরে আসতেন না। তবে আমার সম্পর্কে সব সময় সহৃদয় ছিলেন—বিশেষ করে আমরা যখন খেতে যেতাম বা ডেকে একসঙ্গে বেড়াতাম; আমার স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে তিনি খুব সজাগ থাকতেন।

আমার স্বামী ববের বিষয় কিছু জানতেন না।

জাহাজ বন্দরে গিয়ে ভিড়ল। কাস্টমসের বেড়া পার হয়ে এলাম। তারপর আমি বাস্কেটের ডালা তুলতেই বব্‌ তার মাথা বের করল। আমার স্বামী পিছু হঠে গেলেন তারপর সামলে নিয়ে বললেন, পোষা নিশ্চয়ই ?

আমি মাথা নাড়লাম। এ ব্যাপারে আর কোন কথা হল না। আমরা হোটেলে পৌঁছলাম। সেখানে আগে থেকেই ঘরের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। দুটো আলাদা ঘর। অবশ্য মাঝখানে একটা বসবার ঘর ছিল।

বব্‌কে আমি বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিলাম। বাস্কেট থেকে বেরিয়ে কোচের ওপর নিজেকে পরিপূর্ণভাবে ছড়িয়ে ফণা তুলল। ঘরের মধ্যে

আমি যেদিকে যাই চোখ ফিরিয়ে আমাকে নজর করতে থাকে—মাঝে মাঝে মৃদু শব্দ করতে লাগল মেজাজ খুশি থাকলে যেমন করে থাকে।

পরের দিন সন্ধেবেলায় ডিনার খাবার সময় আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, তোমার জন্যে ফ্লাট খুঁজতে বাইরে গেছিলাম। কেনসিংটনে একটা ঠিকও করে ফেলেছি।

আমি বললাম, তুমি!—তুমি কোথায় থাকবে?

আমার জন্যে ভেবো না। তিনি মাথা নাড়লেন, আমি ইংলণ্ডের উত্তর দিকে যাচ্ছি আমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে। রাজনীতির জীবনে ক্লান্ত—ভাবছি ব্যবসা-ট্যাবসা করব।

কিন্তু। আমি তোতলাতে লাগলাম, আমরা আর একসঙ্গে থাকব না?

প্রিয়তমে। দার্শনিকের হাসি হেসে তিনি বললেন, আমরা তো কখনো একসঙ্গে থাকিনি—তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি! এত দেরিতে সেটা করতে যাওয়া খুব বোকামি হবে।

পরের দিন বব্‌কে নিয়ে আমি কেনসিংটনের ফ্লাটে চলে গেলাম। সঙ্গী রইল একটি পরিচারিকা।

স্যার হেনরী একবার মাত্র ভেতরে এসেছিলেন আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে দরকারি জিনিসপত্রের ঠিক মতো ব্যবস্থা হয়েছে কিনা দেখতে। পরদিন তিনি লণ্ডন ছেড়ে চলে গেলেন তারপর তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তা প্রায় বছর দুয়েক হয়ে গেল।

প্রথম কয়েক মাস স্বামীর সঙ্গ না পেয়ে কেমন যেন লাগত—যদিও এমনিতে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনারের সময়ে ছাড়া আমাদের কখনো দেখা হত না।

শুধু বিলের টাকা মেটাবার জন্যেই পুরুষদের দরকার পড়ে না—দেয়ালে পেরেক পুঁততে গেলেও দরকার হয়। তা সত্ত্বেও আমি নিজের মতো সুখি ছিলাম। আমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারি—যেখানে খুশি যেতে পারি। কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না—কারো নির্দেশ মতো চলতে হবে না।

আগে সমাজকে পরোয়া করিনি—আর এখন তো সেইসব মহিলা বা পুরুষদের খুশি রাখতে সাজগোজ করতে হবে না যাদের তোষামোদ আমাকে একঘেয়েমির ক্লান্তিতে ডুবিয়ে মারত।

আমার একমাত্র আনন্দ ছিল, প্রত্যহ চিড়িয়াখানায় গিয়ে জন্তুদের খেতে দেওয়া অথবা সাপের ঘরের সামনে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া।

এ সময় বব্ দৈর্ঘ্যে তার পূর্ণ আকার পেয়েছিল আর একথা বলা বোধহয় অস্বাভাবিক মনে হবে যে আমি এই প্রাণীটিকে পৃথিবীতে সব চেয়ে ভালোবাসি ; বোধহয় আমার জীবনে এর আগে কোন কিছুকে এমন করে ভালোবাসিনি !

তা সত্ত্বেও, আমার এমন একজন পুরুষ বন্ধু দরকার যিনি আমাকে বুঝতে পারবেন—যার কাছে আমার ভাবনা-চিন্তাগুলো তুলে ধরতে পারব। আমার কোন লাভারের দরকার নেই।

টেবিলের ওপর লেডী ওয়েদারবী তার হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন, আপনি কি আমার বন্ধু হবেন কিরো ? আপনি কি সময়-সময় এসে আমাকে দেখে যাবেন ?

তার চোখে এমন একটা বিষণ্ন নির্জন আগ্রহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে আমি অস্বীকার করতে পারিনি। আমি তার হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে সম্মতি জানালাম।

কয়েক সপ্তাহ বাদে আমি লেডী ওয়েদারবীর ফ্লাটের বেল বাজালাম। আমাকে আন্তরিক ভাবে অভ্যর্থনা জানালেন লেডী। বব্‌ও আমার উপস্থিতিতে বিরক্তি প্রকাশ করল না কাজেই লেডী ওয়েদারবীর ফ্লাটে ফি-হপ্তা নিয়মিত হাজির হতে লাগলাম।

হঠাৎ একদিন কাগজ জুড়ে দারুণ এক উত্তেজক খবর বের হল। তাতে শহর জুড়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হল। লেডী ওয়েদারবী যে ফ্লাটে থাকেন সেই ফ্লাটের ওপরের ফ্লাটের এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা অনেক রাত্রে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়

প্রকাণ্ড এক গোখরো সাপের পাল্লায় পড়েছিলেন। সাপটা তাদের ফ্লাটে যাবার সিঁড়ির রেলিং পেচিয়ে ছিল। ভদ্রলোকের স্ত্রী ছিলেন আগে—তার হাতে সাপের ফণা লাগতে তিনি গোঙানির মতো শব্দ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। সাপটা বোধহয় ঘুমোচ্ছিল।

ভদ্রমহিলার চিৎকার শুনে অন্য ফ্লাটের বাসিন্দারা ছুটে আসেন; পুলিসের হুইসিল শোনা যায়। জনসাধারণ গভীর উৎকণ্ঠায় ভিড় করে আসেন।

ইতিমধ্যে লেডী ওয়েদারবী দরজায় এসে হাজির হয়ে,বব্ বলে ডাকতেই ভিড় আর হট্টগোলে হতভম্ব সাপটা তার নিজের ঘরে ফিরে যায়।

সাপের মতো এরকম অস্বাভাবিক পোষ্য লণ্ডন শহরের সম্ভ্রান্ত ফ্লাট বাড়িতে রাখা যায় কিনা খবরের কাগজে জানতে চাওয়া হয়েছে। লেডী ওয়েদারবীর বাড়িওয়ালা তখুনি তাকে উঠে যেতে বললেন। তিনি ও আর ঝুঁকি নিতে সাহস করলেন না। চারপাশে বাগান সুদ্ধ একটা বাড়ি নিলেন। তাতে ববের সুবিধে হল।

একটা উত্তেজনা থেকে আরেকটা উত্তেজনা আসে।

কয়েক সপ্তাহ পরে লণ্ডনের মানুষ আশ্চর্য হয়ে গেল, জেনারেল স্যার হেনরী ওয়েদারবী কোর্টে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেছেন কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন: সহবাসের দ্বারা বিবাহ কোনদিন সিদ্ধ হয়নি।

লেডী ওয়েদারবী এ ব্যাপারে কোন বিরোধিতায় গেলেন না—কোর্ট ও বিচ্ছেদের অনুকূলে রায় দিল। কয়েক মাসের মধ্যেই স্যার হেনরী একজন বিধবাকে তার বৈধ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন।

একটা বক্তৃতা দেবার ব্যাপারে আমি কয়েক বছর আমেরিকায় ছিলাম। ফেরবার পর একদিন সকাল বেলায় লেডী ওয়েদারবীর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম:

প্রীতিভাযনেষু,

কাগজ পড়ে জানতে পারলাম আপনি দেশে ফিরেছেন। আমি অত্যন্ত অসুস্থ্য—যতো শিগ্রি পারেন একবার আসবেন।

সেই দিন দুপুরের পর লেডী ওয়েদারবীর চেল্‌সী এমব্যাঙ্কমেণ্টর

বাড়িতে হাজির হলাম। আমাকে তার তিন তলার শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

তাকে দেখে আমি আঁৎকে উঠলাম। একদা রূপসী এই মহিলা কি হয়েছেন—হাড়ের ওপর শুধু চামড়াটুকু লেগে আছে!

আমি দেখলাম, শুভ্র হাতটা বের করে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন।

জুনমাসের উষ্ণ অপরাহ্নে উত্তর সাগরের হাসের পালকের তৈরি পাশ বালিশও তাকে গরম রাখতে পারছে না। সাপটাও তার পাশে লম্বা-লম্বি এলিয়ে আছে প্রায় তার গায়ের ওপর—বোধহয় তার শরীরের তাপ দিয়ে তাকে বাঁচাতে চাইছে। মনে হচ্ছিল ওটাও মুমূর্ষু—তার চকচকে চোখের ওপর সাদা আঁষগুলো যখন-তখন এসে পড়ছিল। এরকম ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য আমার চিরকাল মনে থাকবে।

খুব আস্তে কিন্তু স্পষ্ট ভাবে লেডী ওয়েদারবী বললেন, বন্ধু আপনি এলেন কিন্তু শেষ সময়। বছর খানেক ধরে এই অসুখ চলছে কোন যন্ত্রণা বা অস্বস্তি কিছু নেই।

লণ্ডনের সেরা-সেরা ডাক্তারকে দেখিয়েছি কেউ এই ব্যাধির কোন কারণ খুঁজে পাননি। এ কেস সম্পর্কে সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছে। মিস উইলোবী ছাড়া কেউ এখানে থাকে না। বেচারি আমার সেবায় দিন রাত্তির নিজেকে সঁপে দিয়েছে। বেশিক্ষণ আর বাঁচব না। বুঝতে পাচ্ছি কাল সকাল হবার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে। আমি জানি আমার বাসনা পূর্ণ করার জন্য আপনার ওপর নির্ভর করতে পারি। আপনি ছাড়া আর কে আছে যাকে দিয়ে কাজগুলো হবে। বলুন আপনি, যে কাজের কথা আপনাকে বলব তাই আপনি করবেন।

আমি তার হাতটা আমার হাতে তুলে নিয়ে বললাম, প্রিয় বান্ধবী, আপনার সব ইচ্ছাই আমি পূর্ণ করব।

সে আমি জানি। লেডী ওয়েদারবী বলে চললেন, আমার মৃত্যুর পর বব্‌ও বাঁচবে না। আমার ইচ্ছে, আমার মৃত্যুর পর বব্‌কে আপনি নিজে গ্যাস দিয়ে মেরে ফেলবেন। দেখবেন ও যেন কষ্ট না পায়। ওর এবং আমার দেহ আগুন দিয়ে সৎকার করবেন। তারপর দু'জনের ছাই

একসঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। শেষে ভস্মাধারটা নিয়ে দূর সমুদ্রে ফেলে আসবেন।

কথা দিন। ফিসফিস করে বললেন লেডী ওয়েদারবী, হয়তো পরের জন্মে আমরা আবার মিলব।

কথা দিলাম। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।

কৃতজ্ঞতায় তিনি আমার হাতে চাপ দিলেন। কথা বলার শক্তিটুকুও তার ছিল না। বালিশের মধ্যে ডুবে রইলেন খানিকক্ষণ—মনে হল নিঃশ্বাসও আর পড়ছে না।

মিস উইলোবী ভেতরে এলেন। আমি তাকে কাল সকাল ন'টার সময় আসব বলে বিদায় নিলাম।

পরদিন সকালে আবার গেলাম। দরজার গোড়ায় মিস উইলোবীর সঙ্গে আমার দেখা হল। আমাকে অবশ্য বলবার দরকার ছিল না যে সব শেষ হয়ে গেছে। সারা বাড়িতে মৃত্যুর চিহ্ন অনুভব করছিলাম।

আমরা ওপরে শোবার ঘরে গেলাম। জানালাগুলো হাট করে খোলা। বিছানার পাশে রাখা বুদ্ধদেবের মূর্তিব পায়ের কাছে রাখা জুন মাসের সকালে ফোটা ছোট লিলি ফুল বাতাসকে সুগন্ধে ভরে তুলেছে।

যখন মনে পড়ল, বব্‌কে আমি নিয়ে যাব বলে কথা দিয়েছি তখন আমি কেঁপে উঠলাম। বব্ সেই একই ভাবে পড়েছিল তার ফণাটা লেডী ওয়েদারবীর কাঁধে রেখে। কাল যেমন দেখে গেছিলাম।

বিছানার দিকে এগিয়ে লক্ষ্য করলাম, আঁষগুলো চোখের ওপর পর্দার মতো নেমে এসেছে। বব্‌কে নিয়ে কোন আতঙ্কের মধ্যে পড়তে হবে না বলে নিশ্চিন্ত হলাম। বব্ সেই রাত্তিরেই মারা গেছিল।

মৃত বব্‌কে বাস্কেটে করে নিয়ে আগুনে সৎকার করলাম তারপর লেডী ওয়েদারবীর ইচ্ছে মতো দু'জনের ছাই একসঙ্গে মিশিয়ে দিলাম। পরে মিস উইলোবী আর অ ম নৌকোয় করে সমুদ্রের ভিতরে অনেকখানি গিয়ে ভস্মাধারটি জলে ফেলে দিয়ে এলাম।

সেদিন সন্ধেবেলা গ্যারিকে একটা থিয়েটার পার্টিতে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম এমন সময় নিচের চিঠিটা এল। একটি বিশেষ পত্রবাহক সংস্থা পৌঁছে দিয়ে গেল।

সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ,
বার্কিংহাম স্ট্রীট, স্ট্রাণ্ড,
লণ্ডন, ডবলিউ. সি.

বন্ধু, আজ রাত এগারোটায় ব্ল্যাকহিথ স্টেশনে দেখা ক'রো। রিভলবারটা সঙ্গে এনো। দরকার হতে পারে। নিরাশ করো না।

ম্যাক্স মার্কহ্যাম।

চিঠিটা নিরাশ করলেও তার মধ্যে খুশি হবার মতো কিছু ছিল।

মার্কহ্যাম সব সময় উত্তেজনার পথে চলে। আর স্টেজের নাটকের চেয়ে জীবনের নাটকে উত্তেজনা অনেক বেশি। সেদিক থেকে রোমাঞ্চকর একটা সন্ধ্যার সম্ভাবনা মন্দ কি!

ম্যাক্সের স্বল্প পরিসর চিঠির অর্থ, একটা প্রেতাত্মার হদিশ করা। যা ইতিমধ্যে আমরা দু'জন আরো অনেকবার করেছি। তার নির্দেশ তোমার রিভলবারটা সঙ্গে এনো।' চমকে দেবার মতো বা আশ্চর্য হবার মতো কিছু নয়। এ সব তার চরিত্রের সঙ্গে মিলে যায়। সে সব সময় রিভলবার নিয়ে ভূত খোঁজে। পাদ্রীদের কাছে জর্ডন নদীর জল যেমন দরকারি ম্যাক্সের কাছে রিভলবারও তেমনি জরুরি। যাই হোক, ম্যাক্সের কথা মতো, পিস্তল আর কিছু কার্টিজ পকেটে ফেলে ট্রেন ধরতে বেরিয়ে পড়লাম।

আমার বন্ধু ম্যাক্স প্রেত-চর্চা সমিতির সবচেয়ে উৎসাহী সদস্য। সে তার সবটা সময় বরাদ্দ করে রেখেছে নকল মিডিয়ামের চালাকি ধরতে অথবা ভূত কিম্বা ঐ ধরনের ব্যাপারের জন্যে। তা হলেও

পরলোকে তার দৃঢ় আস্থা। সে গভীর ভাবে বিশ্বাস করে মৃত আত্মার সঙ্গে জীবিত মানুষের যোগাযোগ করা সম্ভব।

ম্যাক্স প্রেতাত্মা-চর্চার জালিয়াতদের কড়া সমালোচক আর এই সমালোচনার জন্যে অনেক মিডিয়ামের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে সে চায় পরলোক-চর্চার অঙ্গন থেকে জালিয়াত ও ধাপ্পাবাজির ঝোপঝাড় ও আগাছাগুলো একেবারে মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলতে।

ম্যাক্স আমাকে অলৌকিক অনুভূতি ও দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ বলে মনে করে। অন্তত একবার আমি নিশ্চিতভাবে তার ধারণা যে সত্যি সেটা প্রমাণ করতে পেরেছিলাম। সেই যেবার ম্যাক্স আমাকে ফেলে একলাই ম্যানচেষ্টারে গিয়েছিল সেই মেয়েটির ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে— তিনমাস যে ভরে ছিল।

আমি কিছু না জেনেই তাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম, 'আজ রাত্রের এক্সপ্রেস ধ'রো না। অপেক্ষা কর।'

ঘটনাচক্রে, সেই রাত্রে এক্সপ্রেসটা দুর্ঘটনায় পড়ল আর প্রায় সব যাত্রী অল্পবিস্তর আহত হয়। এই ঘটনায় আমাদের সৌহার্দের বন্ধন দৃঢ় হল। দুটি বিপরীত চরিত্রের লোক খুব কাছাকাছি এসে গেল।

ব্ল্যাকহিথ স্টেশনে হুড়মুড় করে নামতেই বন্ধুকে দেখলাম। হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে স্টেশনের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পায়চারি করছে।

এই-যে ঠিক সময়েই এসে গেছ! আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাক্স, আমাদের দু'মাইল পথ হাঁটতে হবে। এখন কোন প্রশ্ন ক'রো না। যেতে-যেতে বলবো সব তোমাকে। আমাদের ঠিক বারোটার আগে পৌঁছতে হবে।

ভূত-ভূত গন্ধ পাচ্ছি ম্যাক্স! ব্যাপার কি?

শোন তা'হলে। হালফিল এই মজার ব্যাপারটার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। কী দাঁড়াবে এখনি বলা যাচ্ছে না তবে দেখেশুনে সাবেকী ধরনের একটা ভূতের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ম্যাক্স হেসে কথাটা শেষ করল, মাঝ রাত্তিরে যে হাঁটে!

যে-বাড়িটায় আমরা যাচ্ছি যে-কোন প্রাচীন প্রাসাদের মতো ইতিহাসের পাতায় তার সম্পর্কে প্রচুর সর্বনাশা রক্তপাতের ইতিবৃত্ত আছে। বাড়িটা তৈরি হয় ১৮৪৭ সালে। বর্তমান মালিকের ঠাকুর্দাই এটা তৈরি করেন। একটা নির্জন এলাকায় বাড়িটার স্থিতি—তবে একটু দূরে সন্ন্যাসীদের একটা পুরনো ভাঙাচোরা সমাধিস্থানের অবশেষ পড়ে আছে। আর সমস্ত ঝামেলা এই কবর এলাকা থেকেই হচ্ছে।

শোনা যাচ্ছে, এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রেতাত্মা প্রায়ই হানা দিচ্ছে।

বুঝে উঠতে পারছি না, কয়েক শ' বছর আগে যিনি মারা গেছেন হঠাৎ কেন যে উনিশ শতকের একেবারে শেষে হাজির হয়ে এমন ঝামেলা বাধাতে শুরু করলেন !

বাড়িটা তৈরি হবার পর থেকে হত্যার পর হত্যা, আত্মহত্যার পর আত্মহত্যার যতো ঘটনা ঘটে গেছে তা নিয়ে কেউ কখনো ভয় পায়নি বা কোন ভৌতিক গল্প চালু হয়নি। মাত্তর বছর খানেক আগে এই সন্ন্যাসীর প্রেতাত্মা হাজির হয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন।

প্রাসাদের বর্তমান মালিক বছর খানেক আগে, আমেরিকায় বেড়াবার সময় একদিন সকালে পিলে চমকানোর মতো খবর পেলেন, প্রাসাদের একটা ঘরে তার বাবা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। খবর পাওয়া মাত্তর ভদ্রলোক তার নতুন বৌকে নিয়ে প্রাসাদের দখল নিতে দেশে ফিরলেন।

ভদ্রলোকের স্ত্রী টেক্সাসের মেয়ে। সুন্দরী। তার মধ্যে ভয়-ডর কিছু নেই। ভূতের নাম-গন্ধও শোনেন নি। প্রাসাদে থাকতে এসে প্রথম ভূত দেখলেন।

একদিন রাতে ভদ্রমহিলা তার ছেলের ঘরে ঢুকে দেখেন, নার্স ঘুমিয়ে পড়েছে আর বুড়ো এক সন্ন্যাসী তার ছেলের দোলনার ভেতর ঝুঁকে পড়েছে। মহিলা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যান। তাকে সাহায্য করতে লোকজন এসে দেখে, সন্ন্যাসী অদৃশ্য হয়ে গেছে আর বাচ্চাটার কপালের ওপর ক্রুশের চিহ্ন।

সেই দিন থেকে সন্ন্যাসী যখন-তখন দেখা দেয়। এমন কি দিনের

আলোতে করিডোরে-সিঁড়িতে হেঁটে চলে বেড়ায়। আর প্রত্যেক রাত্রে ঘড়িতে বারোটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত একটা আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে। তখন বাড়িটা কাঁপতে থাকে। মনে হয় কেউ যেন ভিৎ ধরে নাড়া দিচ্ছে।

বাড়ির চাকর-বাকর ইতিমধ্যে কাজ ছেড়ে পালিয়েছে। ছিল শুধু মাত্তর রাঁধুনী। দিন কয়েক আগে দেখা গেল সে বেচারাও গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছে, ঠিক সেই জায়গাতে যেখানে মালিকের বাবাও গলায় দড়ি দিয়েছিলেন। এ রকম অবস্থায় যদি সবাই বাড়ি ছেড়ে পালায় তবে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

এরপর থেকেই বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। অবশ্য রাত বারোটার পরে সেই পিলে চমকানো আওয়াজগুলো রোজই শোনা যায়। এর মধ্যে সন্ন্যাসীকে আর দেখা যায়নি। তবে পরশু দিন প্রাসাদের কাছাকাছি একজন ভদ্রলোক সন্ন্যাসীকে দেখতে পান বলে জানিয়েছেন। তার কথা বিশ্বাস করবার মতো যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে। আমাদের যাবার পথে তার বাড়ি পড়বে। রাতটা তিনজনের প্রাসাদে থাকবার ব্যবস্থা করেছি—তারপর দেখা যাবে কি হয়।

সত্যি কথা বলতে কি, ম্যাক্সের ব্যবস্থাটা আমার ভালো লাগল না। সৌভাগ্যবসত ম্যাক্সের গল্পটা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি সুতরাং চটপট পা চালিয়ে ম্যাক্সের বন্ধুর ছোট্ট সুন্দর বাড়িটাব সামনে গিয়ে হাজির হলাম।

ম্যাক্সের বন্ধু ডাক্তার এ্যাপলটন আমার মনে ভয় ধরিয়ে দিলেন। ম্যাক্স মার্কহ্যামকে তিনি ধরা গলায় বললেন, আমি দুঃখিত আপনাদের সঙ্গে থাকবার কথা দিয়েছিলাম। ব্যাপারটায় আমাদের হস্তক্ষেপ করার আগে গভীর ভাবে ভেবে দেখা দরকার। আমি আজ সকালে সেই প্রেতাত্মাকে দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম। বলতে কি, এমন বিদঘুটে শয়তানি-ভরা মুখ আমার জীবনে দেখি নি!

যত্তো সব গাঁজাখুরি! ম্যাক্স হেঁকে উঠল, এতদূর এগিয়ে আর ফেরা যায় না।

প্রাসাদে পৌঁছতে মিনিট-পনেরোর বেশি সময় লাগবে না। চটপট পা চালালে দেখবে তোমার সাহস ফিরে আসছে।

নির্বোধদের বেপরোয়া ঝুঁকি নেওয়া সম্পর্কে ডাক্তার মন্তব্য করলেন, দেবতারা যেখানে পা দিতে ডরায়....বোকারা সেখানে....

অবশ্য ডাক্তার কয়েক মিনিটের মধ্যে কোটটা গায়ে চাপিয়ে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। আমরা গন্তব্যস্থানের দিকে পা বাড়ালাম।

মিনিট দশেক হাঁটবার পর সন্ন্যাসীদের ভেঙে-পড়া পুরনো কারখানা চোখে পড়ল। চাঁদের আলোয় সেই ধ্বংশাবশেষের ওপর শীতল নৈঃশব্দ ছড়িয়েছিল। পিছন দিকে পাইনের বন একদল প্রেত-সেনার মতো দাঁড়িয়ে বাতাসে তাদের ডালপালা নাড়ছিল।

এই পাইন বনের ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পরিত্যক্ত প্রাসাদ—জানালার কপাট নেই—কাচের সার্সি ভাঙা। অন্ধকারে সেই প্রাসাদের জরদগব অস্তিত্ব একটা অশুভ আতঙ্কের আভাস এনে দেয়।

গাছপালার ছায়া মাড়িয়ে প্রাসাদের পেছন দিকে পৌঁছলাম তারপর একটু চেষ্টা-চরিত্তির করে একটা জানালা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলাম। খোলামেলা জানালার ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে—সেই আলোতে পথ দেখে আমরা সম্ভবত ডাইনিং হলে গিয়ে পৌঁছলাম। তারপর দরজা বন্ধ করে মোমবাতি জ্বেলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বেশিক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হল না।

কাছাকাছি কোন ঘড়িতে যেই ঢং-ঢং করে বারোটা বাজল, আমরা এমন একটা শব্দ শুনতে পেলাম—আমাদের বুকের ধুকধুকানি থেমে গেল বুঝি। আমরা আমাদের জায়গা থেকে স্প্রীংয়ের মতো উঠে দাঁড়ালাম আর পরস্পরের দিকে ত্রাসে-আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে তাকালাম। আমাদের মনে হল, ঘড়ির কাঁটায় বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদটি প্রচণ্ড আঘাতে থরথর করে কেঁপে উঠল—মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি ভিত ধরে নাড়া দিচ্ছে। প্রত্যেকটা দরজা ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দে খুলে যাচ্ছে আর

দড়াম করে করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জানালার খড়খড়ি-সার্সি ঝন ঝন আওয়াজ করে একবার খুলে যাচ্ছে একবার বন্ধ হচ্ছে। একটা দুরন্ত পাগলা বাতাস সাপের মতো ফুঁসে উঠে সহস্র ফনায় ছড়িয়ে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ছুটে যাচ্ছে। বোধহয় প্রবৃত্তিরবশে আমরা আমাদের ঘরের দরজার দিকে চোখ ফেললাম। দরজাটা খোলা ছিল।

সেখানে বোধহয় কিছু দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ মেঘ ভেঙে চাঁদের আলো ছড়িয়ে গেল। দেখলাম, সেই সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছে।

আমার বুকের মধ্যে ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। বোধহয় আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতাম, সেই সময় একটা রূঢ় অট্টহাসি হঠাৎ আমাদের ওপর ফেটে পড়ল আর সন্ন্যাসী অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত দেরি না করে আমরা আমাদের জিনিষপত্তর তুলে জানালা খুলে প্রাসাদের বাইরে লাফিয়ে পড়লাম আর কে-কার-আগে-যেতে-পারে এই রকম একটা পণ করে ডাক্তার এ্যাপলটনের বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলাম।

আমাদের মধ্যে ম্যাক্সই প্রথম সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল, কী আহাম্মুক আমরা! জীবনে কখনো এ রকম ভয় পাই নি!

আমি আর ডাক্তার এ্যাপলটন দু'জনেই তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করলাম। আর এ ব্যাপারে কোন অনুসন্ধান চালাতে ঘোরতর আপত্তি জানালাম।

সে রাত্তিরের মতো আমরা ডাক্তার এ্যাপলটনের বাড়িতে কাটালাম।

দিনের আলো হবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের সাহস ফিরে এল। ভালো করে প্রাতঃরাশ সেরে আমরা শহরে ফেরবার আগে প্রাসাদের চারধারে একটু ঘুরতে বের হলাম। সেখানেই আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম, আমরা তিনজনে রাত্রে আরেকবার রহস্যভেদের চেষ্টা করব।

দিনের আলো এমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার, ভূত আর ভূতের ভয় উড়িয়ে দেয়। বিশ্বাস করতে পারছিলাম, এই আমরাই কি সেই তিনজন যারা কাল রাতে কি রকম বিপর্যস্ত হয়ে ছুটে পালিয়েছিলাম। তিনজনে আবার সেই ঘরে ঢুকলাম। ঘরের কোন রকম পরিবর্তন ঘটেনি। সেই বাক্স দুটো যার ওপর আমরা বসেছিলাম, মোমবাতির গলে-যাওয়া চর্বি আর খোলা জানালা যা গলে আমরা পালিয়েছিলাম তেমনি রয়েছে।

ডাক্তার ব্যাপারটা খুব গুরুতর ভাবে নিয়েছিল। অবশ্য সেই মুহূর্ত পর্যন্ত ভূতের এলাকায় তার দাপট নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি। তার ধারণা আমরা জারিজুরি দেখানোর ফলেই প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটেছে।

ম্যাক্স বলল, ভূত-ফুত সব বাজে তার চোখ দুটো তাকে ছলনা করেছে।

কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, তিনজন একই জিনিষ দেখলাম কি করে—একই হাড়-কাঁপানো হাসি শুনলাম কি করে!

আমরা ঘুরে ঘুরে প্রাসাদের ঘরগুলো দেখলাম, ছোট ছেলেটার যে-ঘরে সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটেছিল সেই ঘরটাও দেখলাম। তারপর মাটির নিচেকার ঘরের দিকে নজর দিলাম।

ভূগর্ভের ঘরগুলো বেশ বড়ো—যথেষ্ট আলো আছে। একটা মাত্র ঘরের মুখ সন্ন্যাসীদের কবরের দিকে।

আমরা সেই ঘরে ঢুকলাম। চোখে অন্ধকারের ঘোর কাটবার পর একটা ভয়ঙ্কর রকমের বীভৎসতা আমাদের উদভ্রান্ত করে দিল। আগের রাতে সন্ন্যাসীর প্রেতাত্মার আবির্ভাবের সময় বুঝি এরকমটাই ঘটেছিল!

দেখি, সিলিংয়ে দড়ির ফাঁস লাগিয়ে যে হতভাগ্য বাটলার আত্মহত্যা করেছিল তার কংকালটা মৃদু বাতাসে দুলছে। অতীতের এক ভয়ঙ্কর ঘটনার স্মারক হিসেবে তখনো সেটা ছিল। নীরবে আমরা সেই বীভৎস অবশেষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সরে এলাম। আজ

রাত্রেও আরেকবার ভূতের সঙ্গে দেখা করবার সিদ্ধান্ত করে আমি আর ম্যাক্স শহরে ফিরে এলাম।

আবার রাত এল। আমি ব্ল্যাকহিথ স্টেশনে গিয়ে ম্যাক্সের সামনে দাঁড়ালাম। তার সঙ্গে নতুন একজন ছিলেন, তার নাম মিচেল। তিনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন ডিটেকটিভ। এর আগেও কয়েকবার আমাদের অভিযানের সঙ্গী হয়েছেন।

কাজেই আর দেরি না করে আমরা ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। ডাক্তার তো সঙ্গে একজন ডিটেকটিভ দেখে খুব বিরক্ত হলেন। বললেন, ম্যাক্সের এই অবিশ্বাস নিশ্চিতভাবে প্রেতাত্মাকে প্ররোচনা জোগাবে—তাতে হয়তো আমাদের অনিষ্ট হতে পারে।

যাই হোক, অনেক আলাপ-আলোচনা করে ডাক্তারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি করানো হল।

আইন-শৃঙ্খলার একজন প্রতিনিধি সঙ্গে থাকাতে সাহস বেশ খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। তারপর আমরা যেন শেয়াল শিকার করতে যাচ্ছি ভূতের খোঁজে নয়—এই রকম একটা ভাব নিয়ে হাসি ও খোশ-মেজাজে প্রাচীন সন্ন্যাসীদের সমাধি ভূমির নির্জনতা ভেঙে এগোতে লাগলাম।

সেখানে একটা ভাঙাচোরা সমাধির ওপর বসে বাড়িটার দিকে চোখ রেখে ভূতকে ঘায়েল করবার মতলব আঁটতে লাগলাম।

মিচেলের ইচ্ছে, আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে যাই। একটা দল ঢুকবে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলা কংকালের ঘরে অন্য দল ডাইনিং রুমে পাহারায় থাকবে।

আমাদের কেউ-কেউ এভাবে এগোতে রাজি হল না ; ফলে আমরা ঠিক করলাম, সবাই একসঙ্গে থাকব আর ডাইনিং রুমের বদলে হল ঘরের সদরে পাহারায় থাকব।

আমরা আরেকবার চোরের মতো চুপিসারে পিছনের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সাবেক ধরনের হলঘরের অন্ধকার কোণে গিয়ে জমায়েত

হলাম। আমরা এমন সাহসী যে আলো সঙ্গে নেবার দরকারও মনে করিনি। তবে আলোর দরকার ছিল না। চাঁদের আলো ছিল! বড়-বড় জানালার ভেতর দিয়ে ঢুকে প্রাসাদটাকে দিনের মতো স্পষ্ট করে তুলেছিল।

বারোটা বাজল। পাশের কোন চার্চ থেকে একটানা ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পেলাম কিন্তু কিছু ঘটতে দেখা গেল না। চারদিকে মৃত্যুর স্তব্ধতা থমথম করছিল।

ম্যাক্সের স্বভাবতই আশাভঙ্গ হল। ডাক্তার বোধহয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন আর মিচেল ভাবছিলেন, কী মহা-আহাম্মক আমি এমন একদল বোকার সঙ্গে এসে জুটেছি।—মিস্টার মার্কহ্যাম ম্যাক্সকে তিনি বললেন, এমন ব্যাপার তো কখনো দেখিনি! এমন কি টেবিল চাপড়ানোর মতো ব্যাপার-ট্যাপারও হল না। ভূতটা আমাদের খরচা -পত্তর উসুল করতে দিল না!

আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করলাম, আবার আমরা মাটির নিচের সেই ঘরে গিয়ে হাজরে দেব। তারপর আলো না জ্বেলে আমরা নানান পথ ঘুরে সেই ঘরের সামনে হাজির হয়ে আশ্চর্য হলাম ভিতর থেকে দরজা বন্ধ।

মিচেল দরজার চাবি ঢোকানোর গর্তে চোখ দিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে ফিসফিস করে বললেন, ঘরের মাঝখানে কী যেন একটা ঝুলছে!

ডাক্তার ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, কী আর হবে সেই দড়ি আর বীভৎস কঙ্কালটা ছাড়া!

এবার ম্যাক্স নিজে গর্তটায় চোখ রাখল ব্যাপারটা দেখার জন্যে; আমরা দেখলাম, ভয়ে তার শরীরেও কাঁপুনি ধরেছে। কাগজের মতো ফ্যাকাসে মুখে সে আমাদের দিকে ফিরলো।

আমার বা ডাক্তার কারো সাহস হল না গর্তে চোখ দিয়ে ব্যাপারটা দেখি। আমরা সরে এসে মিচেলের যাবার পথ করে দিলাম। মিচেলের ইচ্ছে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলেন।

সেই সময় দরজার কপাট দুটো হঠাৎ যেন ছিটকে সরে গেল আর যা দেখলাম তাতে ভয়ে জমে যাবার দাখিল !

সেই মৃত্যুর ফাঁসে গলা আটকে এক সন্ন্যাসীর লাশ ঝুলছে ! তার মুখের নারকীয় জিঘাংসা অবরুদ্ধ আক্রোশে ও যন্ত্রণায় আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মাটির নিচের ঘরে ঝুলকালির মতো দগদগে অন্ধকারে সন্ন্যাসীর মরচে-ধরা সাদা শরীর অসমীচীন বৈপরীত্যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা যেন সেখানে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ একটা নতুন বিপদের সঙ্কেত আমাদের সজাগ করে দিল। কেউ যেন দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। আমাদের পিছন দিক থেকে পায়ের শব্দ পাচ্ছিলাম। চটির শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল।

আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম। মনে হল বুকের ধুকপুকুনি থেমে গেছে। আমার যেন জ্বর এসে গেছে—হাঁটু কাঁপতে লাগল।

দেখলাম, চাঁদের আলোয় সোজা হেঁটে আসছে এক সন্ন্যাসী। সোজাসুজি আমাদের দিকে।

কয়েকমুহূর্তের মধ্যে আমাদের ওপর এসে পড়বে! আমরা চারজনই বিদ্যুতবেগে ডানদিকের একটা ঘরে সরে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে কপাট দুটো আটকে আমরা চারজন শক্তিশালী পুরুষ চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আর মনে মনে প্রহর গুনতে লাগলাম। কখন সেই ভয়াল ত্রাসের বস্তুটি আমাদের পার হয়ে যায়।

সেই চটির এলোমেলো শব্দ একটু-একটু করে এগিয়ে আসতে লাগল তারপর দরজার সামনে দিয়ে চলেও গেল।

আমরা কান পেতে শুনতে লাগলাম, শব্দটা ক্রমশঃ পাতালের সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল – যেখানে সেই ফাঁসের দঁড়ি আর কঙ্কালটা ঝুলছে।

একটু পরে নির্জনতা নেমে এল প্রাসাদে। মৃত্যুর মতো স্থির নৈঃশব্দ্য প্রাসাদকে ঢেকে ফেলল।

কতক্ষণ যেন কেটে গেল আমাদের কথা বলতে। বোধহয় কেউ সাহস পাচ্ছিলাম না! তারপর মিচেল আস্তে দরজা খুলে চারদিকে

উঁকিঝুঁকি মেরে বললেন, না আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এমন কি সন্ন্যাসীর যে লাশটা কড়িকাঠ থেকে মৃদু বাতাসে দুলছিল সেটাও অদৃশ্য।

আর কোন কথা না বলে মিচেল ফেরবার পথ ধরলেন; আমরাও তাকে অনুসরণ করলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাইরে গিয়ে পড়লাম তারপর ডাক্তারের বাড়ির পথ ধরলাম। আমাদের কারো বলবার কোন কথা আর ছিল না। আমরা মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম, ভূতকে ঘাটানো আর ঠিক হবে না।

পরদিন সকালে ব্যাপারটা সম্পর্কে দু-একটা কথা বলে যে যার জায়গায় সরে পড়লাম।

একদিন, তা প্রায় মাস তিনেক পরে হবে, সকালের কাগজটা তুলে পড়লাম ঃ

ব্ল্যাকহিথে চমকপ্রদ আবিষ্কার!! হানা বাড়িতে নোট জালিয়াতদের আখড়া!

হ্যাঁ, সত্যি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। আমি ভাবলাম, একেবারে হতাশ হইনি। যে বাড়িটাতে আমরা গেছিলাম সেখানে পুলিশ হানা দেয়। আমাদের ভূতেরা হচ্ছে একদল বেপরোয়া জাল মুদ্রার কারবারীদের দল। তারা প্রত্যেক রাতে প্রাসাদের ভিতের ওপর বিশাল ভারী লোহার খণ্ড ফেলে ভয়ঙ্কর শব্দ করত। যে সন্ন্যাসীকে আমরা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখেছিলাম সেটা নিখুঁত ভাবে তৈরি একটা ড্যামী, তার কাপড়ে ফসফরাস মাখানো ছিল।

এই হল ব্ল্যাকহিথ রহস্যের সমাপ্তি।

মৃতের করবিচার

লণ্ডনে একদিন রাত্রিবেলায় আমার ঘরে বসেছিলাম। আমি বিস্মিত আর উদ্বিগ্ন হলাম শুনে যে নিচের তলায় গাড়িতে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

বিস্মিত হয়েছিলাম এইজন্যে যে এখন এগারোটা বেজে গেছে আর উদ্বিগ্ন হবার কারণ সারা দিনের কাজের পর এখন আমার বিশ্রাম আর ঘুমের দরকার যাতে পরবর্তী কর্মব্যস্ত দিনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারি।

যাই হোক নিচে নেমে দেখলাম, একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দরজা বন্ধ গাড়িতে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

কোন ভূমিকা না করে তিনি বললেন, শুভ সন্ধ্যা! মশাই, আপনি কি এই মুহূর্তে কোন রকম প্রশ্ন না করে আমার সঙ্গে যেতে পারবেন—সেখানে একজনের হাত আপনাকে দেখতে হবে?

ঠিক বলতে পারব না, এটা আমার এ্যাডভেঞ্চারের না কর কোষ্ঠী বিচারের প্রতি আমার মোহ। কোন রকম দ্বিধা না করেই রাজি হয়ে গেলাম।

আমি গাড়িতে উঠলাম আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি দ্রুত গতিতে হ্যামারস্মিথের দিকে ছুটতে লাগল।

আমি আমার সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলাম; স্পষ্টত বোঝা গেল, সে-রকম চেষ্টা আমার সাধ্যের অতীত। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে গাড়ির গায় হেলান দিয়ে বসে আমার যাত্রা ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে অস্বাভাবিক ভাবনায় ডুবে গেলাম।

গাড়িটা দেখলাম, ভাড়া করা—এটা শহরের যে কোন অংশের যে কোন আস্তাবল থেকে আসতে পারে। আমার সঙ্গীকে আপাতদৃষ্টিতে দেখে সব রকমে ভদ্রলোক বলেই মনে হল। রাস্তার হঠাৎ আলোর

ঝলকানিতে তার হাতের দীর্ঘ সুন্দর আঙুলগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। হাতের চমৎকার আঙুলগুলো যখনই পথে কোথাও গাড়ি থামছিল বা বাধা এসে পড়ছিল তখনই দৃঢ়ভাবে মুঠো করে নিচ্ছিলেন। তার তামার মতো মুখখানা ভারি। পরিলিখন স্পষ্ট অথচ সুশ্রী এবং আভিজাত্যের ব্যঞ্জনা দিচ্ছে। অল্প পেকে-যাওয়া চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা—সব দেখে শুনে মনে হল, বোধহয় অবসর পাওয়া সৈন্য বিভাগের পদস্থ কর্মচারী।

আমরা হ্যামারস্মিথের যতো কাছাকাছি যেতে লাগলাম তাকে ততো বেশি বিহ্বল হতে দেখা গেল। গাড়িটা যখন রিচমণ্ড রোডের দিকে মোড় নিল আমি ভীত এবং বিস্মিত হয়ে দেখলাম ভদ্রলোক কালো রেশমের বড় একটা রুমাল পকেট থেকে বার করে আমাকে চোখে বেঁধে নিতে বললেন।

আপত্তি করা বৃথা। তিনি দৃঢ় সঙ্কল্পের মানুষ। তবু আমি যত বাধা দিতে লাগলাম তিনি তত জোর করতে লাগলেন। যাই হোক আমি এই দুঃসাহসিক অভিযানের শেষ পর্যন্ত দেখতে ইচ্ছুক ছিলাম তাই শেষে রাজি হলাম।

মিনিট দশেক পরে বুঝলাম গাড়ি রাস্তা থেকে নামল পর মুহূর্তেই চাকার নিচে নুড়ি পাথরের শব্দে বুঝতে পারলাম গাড়িটা কোন বাড়ির নিজস্ব পথ ধরেছে। তারপরের মুহূর্তে গাড়ি থেমে গেল আর সঙ্গী বাইরে নেমে পড়লেন। গাড়োয়ানের ভাড়া মিটিয়ে আমাকে নিয়ে কয়েক পা দূরে একটা বাড়িতে ঢুকলেন।

আমাকে একটু সময়ের জন্য বসালেন, তারপর আমাকে উঠিয়ে কোন কথা না বলে নরম কার্পেট পাতা সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি শান্ত নৈঃশব্দ্যে উঠতে লাগলেন।

দোতলায় উঠে দরজা খুলে একটা ঘরে আমাকে ঢোকালেন। আমার অনুভূতি সজাগ হয়ে উঠল। কেমন যেন নিথর শৈত্যে গা ছমছমে ভাব! আমাকে একটা চেয়ারে বসে চোখের বাঁধন আলগা করে দিলেন তারপর 'এখুনি আসছি' বলে দ্রুত পায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চোখের বাঁধন এত শক্ত করে বাঁধা ছিল যে আমি কিছুক্ষণ চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। যখন দেখতে পেলাম, দেখলাম, খাড়াভাবে হুড়কো দিয়ে আটকান চেয়ারে বসে আছি। স্বভাবতই আমার চুল দাঁড়িয়ে গেল আর দারুণ একটা ত্রাস আমাকে জড়িয়ে ধরল।

অপেক্ষামান অতিথিপূর্ণ আলোকিত বসবার ঘরের পরিবর্তে—স্বভাবতই যা আমি আশা করেছিলাম, দেখলাম, আমি চাঁদের আলোয় এক নারীর মৃতদেহের পাশে বসে আছি।

বিছানার মাথার ধারের জানালা খোলা।

মৃদু একটা বাতাস তার কপালের কোঁকড়ান চুলে খেলা করে যাচ্ছিল—তাকে ঢেকে রাখা কাপড়টা বাতাসে মাঝে-মাঝে ফুলে উঠছিল। তার বুকের ওপর রাখা এমনি কাঠের ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তির সঙ্গে তার মার্বেল পাথরের মতো শাদা কণ্ঠদেশের একেবারে চমকপ্রদ ভাবে বিপরীত। তার মুখে যন্ত্রণা বা শান্তির কোন চিহ্ন ছিল না। তবে একথা আমি বলব, তার শেষ নিঃশ্বাস ছিল পরম বেদনার। যৌবনে কারো পক্ষে মৃত্যুকে বরণ করা কঠিন বিশেষত যদি সে সুন্দরী হয়; আর এই নারী সুন্দরীও বটে যুবতীও বটে।

আমি যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্থ ভাবনায় ডুবে ছিলাম তখনই দরজাটা খুলে গেল আর আমার যাত্রা-সঙ্গী এসে হাজির হলেন। তিনি টেবিলের ওপর ল্যাম্প জ্বেলে টেবিলটা বিছানার কাছে টেনে নিয়ে এলেন। তারপর আমাকে চেয়ারে বসিয়ে শবদেহের ওপর-কার কাপড়টা সরিয়ে চাপা উত্তেজনায় বললেন, এই হচ্ছে সেই হাত দুটো যা আপনাকে দেখতে হবে।

আমাকে অনেক রকম অদ্ভুত অবস্থায় হাত দেখতে হয়েছে কিন্তু কখনো এ রকম ভয়ঙ্কর ও বীভৎস অবস্থায় হাত দেখতে হয়নি। তা ছাড়া যে কোনদিন আর কথা বলবে না তার হাত দেখে আমার লাভ। মৃত অতীত তার মৃত্যুর মধ্যে ডুবে থাক। আমিও নীরব থাকব। আমি প্রায় এই রকম একটা সিদ্ধান্তে এসেছি এমন সময় মনে হল ঠাণ্ডা একটা নিঃশ্বাস এসে আমার হাতে লাগল। ব্যাপারটা সত্যি না

আমার কল্পনা বলতে পারব না তবে আমি নিশ্চিত বলতে পারি কিছু যেন আমার কানে ফিসফিস করেছিল, দ্বিধা ক'রো না। হাত দেখে সত্যকে প্রকাশ কর।

সে সময় মনে হল আমি যেন আমার সমস্ত ইচ্ছা শক্তি হারিয়ে ফেলছি। মনে হল, আমি যেন কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাব অথবা নিয়ন্ত্রণে চলে গেলাম। অনুভব করলাম, কেউ বিছানার দিকে টানছে। কাঁপতে-কাঁপতে দেখলাম, আমি ঝুঁকে পড়ে সেই হাত দুটো আলতো করে নিজের হাতের ওপর তুলে নিয়েছি।

আমাকে আরো আলো দেবার জন্যে ভদ্রলোক আরেকটা আলো জ্বাললেন; কাছাকাছি কোন টেবিল না থাকাতে বিছানার পায়ের দিকে রাখা কফিনটা টেনে এনে তার ওপর বাতিটা রাখলেন। আমি পড়লাম কফিনের গায় পিতলের প্লেটে লেখা:

এ্যাননিস মর্টন

বয়স ২৪

যদিও মাত্র চব্বিশ বছর বয়েস তবু তার হাতে রেখায় দারুণ উদ্বেগ ও ঝামেলার চিহ্ন আঁকা রয়েছে; তার বিবাহ নির্দেশ করছে স্বামীর প্রতি যে গভীর ভালোবাসা ছিল তার সাহায্যে সে এই সব দুঃখ কষ্ট পার হয়ে গেছে। হাতটা আমি যত পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখতে লাগলাম, আমার সঙ্গীর মুখে নিদারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল আর সেটা একটু একটু করে ভয়ঙ্কর তীব্র হয়ে উঠল।

আমি বললাম, ছোট বেলা থেকেই কারো প্রতি তার গোপন স্নেহ-ভালোবাসা ছিল—আর এই স্নেহ সে গোপনে লালন করে গেছে; তাকে সাহায্য করত—এমন কি টাকাকড়িও দিত—আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত আত্মীয়-স্বজনের কাউকে সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসত।

কারো হৃদপিণ্ডে ছুরি দিয়ে আঘাত করলে যেমন চিৎকার করে ওঠে আমার সঙ্গীও তেমনি চিৎকার করে চেয়ারের গায় মূর্ছিত হয়ে এলিয়ে পড়লেন।

আমি মৃতার হাত দুটো রেখে তার দিকে তাড়াতাড়ি গেলাম।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার জ্ঞান ফিরতে যেই আমার দিকে চোখ পড়ল অমনি ছ'হাত দিয়ে মাথার ছুপাশ চেপে ধরলেন; বোধহয় আমার উপস্থিতিতে কিছু স্মরণে আনতে এবং হিসেব করতে চাইলেন। তার পরই অবাক হয়ে দেখলাম, তিনি যেন কিছু মনে করতে পেরেছেন এই ভাবে হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এলেন। আমাকে ওজর না দেখিয়ে উত্তেজিত ভাবে বললেন, অনেক শুনেছি—হ্যাঁ, যা শুনতে চাই তাই শুনেছি। মশাই এখন আসুন। ঈশ্বরের নামে বলছি এবার আমাকে রেহাই দিন। কয়েকদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা করে সব ঘটনা আপনাকে বলব।

মাস আষ্টেক পার হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সেই অদ্ভুত ঘটনা সম্পর্কে আর কিছু দেখিওনি শুনিওনি। একদিন একটা ট্যাকসি সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়ির দরজায় এসে হাজির। ড্রাইভার আমাকে অনুরোধ করল, তার সঙ্গে চেয়ারিং ক্রশের একটা প্রাইভেট হোটেলে যাবার জন্যে।

হোটেলে পৌঁছনোর পর আমাকে একটা প্রাইভেট বসবার ঘর দেখিয়ে দেওয়া হল, সেখানে একজন কৌচে শুয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। উঠতে না-পারার জন্যে হাত তুলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। গলার স্বরটা আমার চেনা। তখুনি মনে পড়ল আমার অদ্ভুত অভিযানের সঙ্গীর কথা।

তিনি এত সাংঘাতিকভাবে পালটে গেছেন যে তার গলার স্বর ছাড়া তাকে চেনা সত্যি আমার পক্ষে কঠিন হত। সেই প্রথম আমি তাকে দেখলাম, সপ্রতিভ সামরিক ধরন-ধারণের বদলে ভেঙে-চুরে কুঁকড়ে যাওয়া একটা আকৃতি, যিনি এই ক'মাসে একেবারে বুড়িয়ে গেছেন। তার চুলগুলো শাদা আর পাতলা হয়ে এসেছে; তার যে-মুখে অনুতাপ ও যন্ত্রণার কথা শুনেছি তা দেখতে বীভৎস হয়ে গেছে!

এই যে আমাকে চিনতে পারছেন? ভদ্রলোক বললেন, আপনি আসাতে আমি আনন্দিত হয়েছি। আপনাকে এখন সব বলতে চাই। আমার বুকের স্পন্দন থেমে যাবার আগে আপনাকে সব বলে

হালকা হতে চাই। একটু সরে এসে বসুন না। আমার গলায় তেমন জোর নেই।

তার গলার খনখনে কাসিটা থামতে তিনি বললেন, গত আগস্টের সেই রাতের কথা আপনার মনে পড়ে, যখন লণ্ডনের বাইরে একটা বাড়িতে নিয়ে গেছিলাম আর আপনি আমার কথা মতো একটা হাত দেখেছিলেন ?

আমি সায় দিতে তিনি আবার সুরু করলেন, হঁ্যা ওই ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী ছিলেন। বছর কয়েকেরও আগে আমি ভারতবর্ষের সামরিক চাকরি থেকে জাহাজে দেশে ফেরবার পথে সুন্দরী এক মহিলার সঙ্গে দেখা হল। সঙ্গী-হীনা এই মহিলার সঙ্গে তার চাকরানিই শুধু ছিল। সমুদ্র যাত্রায় আমি খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লাম আর ইংলণ্ডে পৌঁছনোর আগেই বুঝলাম, জীবনে এই প্রথম প্রেমে আমি পাগল হয়ে গেছি। চল্লিশ বছর আমার বয়েস হয়ে গেছে—তা ছাড়া ভারতবর্ষের সামরিক জীবনের চাকরির ধকল আমার ওপর দিয়ে গেছে।

মহিলাটির বয়েস মাত্তর চব্বিশ—অনিন্দ্য তরুণী তা সত্ত্বে প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম তার জীবনের কোন রহস্য আছে আর সে সেটা লুকিয়ে রাখার জন্যে উদ্বিগ্ন।

ভূমধ্যসাগরের এক সন্ধ্যায় আমরা দু'জন যখন ডেকে পায়চারি করছিলাম, সেই সময় এক সুযোগে ব্যাপারটা তার কাছে উল্লেখ করেছিলাম।

সে সুরু করেছিল, শিগ্রি নিজেকে সামলে নিয়ে হালকা ভাবে বলল, কর্ণেল মেয়েরা রহস্যের সন্ততি। যদি আমাদের বন্ধুত্ব রাখতে হয়, তবে মনে রাখবেন, আমাকেও আমার রহস্য গোপন রাখতে হবে।

সন্ধের পরে মনে-মনে বারবার কথাটা নাড়াচাড়া করে বুঝলাম ব্যাপারটা প্রথমে আমি যতো হালকাভাবে নিতে চেয়েছিলাম তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অবশেষে আমার মনের মধ্যে ভালোবাসা আর অহংকারের সংঘাত সুরু হল। যাই হোক, আমি যুক্তি দিলাম, পরিচিত হবার আগে মেয়েদের জীবনে যদি কোন গোপনীয়তা থাকে পুরুষের

পক্ষে তা জানবার দাবী করার অধিকার নেই—মেয়েদের পক্ষেও ঠিক তাই। আমি ঠিক করলাম, সেই রাত্রেই তার কাছে যাব এবং বলব, তাকে আমি ভালোবেসে পাগল হয়ে গেছি আর তখুনি জিজ্ঞেস করব, আমার সঙ্গে তার ভাগ্যকে মেলাতে রাজি কিনা!

ভালো মতো একটা সুযোগও জুটে গেল। তাকে দেখলাম জাহাজের একেবারে পিছনে একলা দাঁড়িয়ে জাহাজ-চলার উচ্ছৃত জলরেখায় দৃশ্যমান সাদা পথের দিকে তাকিয়ে আছে। নিঃশব্দে তার দিকে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার কাছে তাকে টেনে নিলাম। যখন আমার দিকে ফিরল দেখলাম তার চোখ জলে ভরা। সে কাঁদছিল।

এ্যাগনিস। আমি বললাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাকে বিশ্বাস কর। তুমি কাঁদছ কেন? তোমার রহস্যটা কি?

আমার হাত দুটো তুলে নিয়ে সে চুমু খেল আর তার চোখ থেকে গরম জলের ফোঁটা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছিল। সে বলল, না, আমি বলতে পারি না। তোমাকে আমি বলতে পারি না। তুমি যদি আমাকে ভালোবাস আমার গোপন কথা কোনদিন জিজ্ঞাসা করো না—সেটাই হবে আমার প্রতি তোমার সম্মানের নিদর্শন।

এ্যাগনিস। আমি বললাম, একটা মাত্র প্রশ্ন তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করবোই। শুধু সেই কথাটার উত্তর দাও আর যা কিছু সব তুমি গোপন রেখো। তুমি কি অন্য কাউকে ভালোবাস? তুমি কি আমাকে ভালোবাসতে পার—পারবে আমাকে ভালোবাসতে?

তুমি যে অর্থে বলছ তেমন করে কোন পুরুষকে আমি ভালো-বাসি না? এ্যাগনিস মৃদু কণ্ঠে বলল, আমি কাউকে ভালোবাসি নি—! তবে এখন আমি ভালোবাসি। আমি তোমাকে আমার হৃদয় দিয়ে, আত্মা দিয়ে ভালোবাসি!

ইংলণ্ডে গিয়ে আমাদের বিয়ে হল। প্রায় তিন বছর আমরা একসঙ্গে আদর্শ জীবন যাপন করেছি। এর মধ্যে আমি তাকে কখনো তার অতীত সম্পর্কে প্রশ্ন করি নি সেও আমায় অতীত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করে নি।

একদিন ডাকঘর থেকে আমার ঠিকানায় আমার স্ত্রীর নামে ভারতবর্ষ থেকে একটা চিঠি এল। চিঠিটা তার কাছে দিয়ে বললাম, ভারতবর্ষে তুমি কাকে চেন? আমি তো ধারনা করতে পারছি না কে সেখানে তোমার বন্ধু হতে পারে!

সে কিছু বলতে গেল। জল ভরে এল তার চোখে। কয়েকটা অসংলগ্ন কথা সে বলতে পেরেছিল তারপরই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

যদি আমি তার পেছনে যেতাম, যদি সহৃদয় হয়ে তার বিশ্বাস অর্জন করতে চেষ্টা করতাম তা হলেই বোধহয় ভালো হত। হায় কপাল, আমার স্বভাব হচ্ছে এই যে এক মুহূর্তে ভয়ঙ্কর ভাবে পালটে যায়। ঈর্ষা এসে আমার হৃদয়কে চেপে ধরে; ভালোবাসাকে পা দিয়ে দলে পিষে শেষ করে দেয়। রাগ যেন আগুনের মতো শিরা-উপশিরা বেয়ে ছুটোছুটি করে মাথায় যখন ওঠে তখন যেন আমি কাকড়া বিছের হুলের মতো উন্মত্ত হয়ে উঠি।

আমার স্ত্রীর কাছ থেকে কয়েকদিন দূরে সরে গিয়ে মনে-মনে ঈর্ষাকে প্রশ্রয় দিতে লাগলাম; আর এমন মতলব আটলাম যাকে প্রকারান্তরে প্রতিহিংসা বলা যায়—শেষে তাই আমাকে দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে দিল!

এখন বুঝতে পারছি, কেন সে আমাকে সামরিক চাকরি ছাড়তে নিষেধ করেছিল। সে হয়তো ভেবেছিল, আমি ভারতবর্ষে গেলে সেও আমার সঙ্গে যেতে পারবে।

ঠিক করলাম, এখন থেকে তাকে নজরে রাখব। আমি যা প্রমাণ করতে চাই তার সূত্র জোগাড় করে তার সামনে হাজির করতে হবে। ফলে সত্য প্রকাশ করতে বাধ্য হবে।

আমি হাসি মুখে বাড়ি ফিরলাম। সে দেখেই বুঝতে পারল আমার ছলনা। আমি তাকে গুটিয়ে নিতে দেখলাম; রাত্রি এলে ফুলেরা যেমন গুটিয়ে নেয়।

সত্যিকারের ঈর্ষা কি বস্তু তা খুব কম লোকই জানে! কেউ এটা পছন্দও করে না তবু এই ঈর্ষা কি ভয়ঙ্কর! কী আগ্রাসী!

যে নারীকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম সেই আমার চোখে সবচেয়ে বড়ো শত্রু বলে মনে হতে লাগল। অনুভব করতে লাগলাম, আমি ফিরে আসাতে এ্যাগনিস কেমন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

তাকে দেখে হাসতাম। আমার হাসি যেন তাকে জমিয়ে দিত। আমার চুমু ছিল উষ্ণ ও বিষাক্ত ; সে সহ্য করতে পারত না।

আমি ড্রইং রুমে ঢুকে সুবিধে মতো জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতাম যাতে তার ওপর নজর রাখা যায়। আমি গাছের আড়ালে কুকঁড়ে-মুকড়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, সে রাস্তা দিয়ে গেলে যাতে দেখতে পাই। পিওনকে ঘুষ দিতাম, যাতে তার সব চিঠি আমার হাত দিয়ে তার কাছে যায়। রাতে উঠে নিঃসাড়ে তার ঘরের কাছে গিয়ে হাজির হয়ে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে আশা করতাম, এমন কিছু দেখব যাতে আমার হিংস্র চোখ তাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে !

একরাত্রে আমি সফল হলাম। নিঃসাড়ে তার ঘরে ঢুকে দেখলাম চিঠি লিখছে। আমার কাজটা ঠিক মানুষের মতো নয়। যদিও এটা বিশ্বাস ও শালীনতার বিপরীত তবু আমি না-করে পারলাম না। আমি ঘরে ঢুকে তার পেছনে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সে লিখছে ঃ

তুমি জান, তোমার ইংলণ্ড ছাড়ার কারণ হিসেবে যে সব গল্প বলেছ সে-সব আমি কখনো বিশ্বাস কবব না। তুমি জান তোমার ভবিষ্যত সম্পর্কে আমি কতখানি ভাবি এবং আশা করে আছি সব কিছু সত্ত্বেও ইংলণ্ডে আবার আমাদের দেখা হবে। কলকাতায় বেরিং-এর প্রযত্নে একটা ড্রাফ্‌ট্ পাঠালাম। এটা তুমি দরকারে লাগিও। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তুমি লড়াই করছ। এখন, আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও তুমি এটা ব্যবহার করে আমার—

আর পড়তে পারলাম না। ঈর্ষায় পাগল হয়ে ভাবলাম, যে চরম আশঙ্কা করেছিলাম, তাই ঘটেছে। চুপিসাড়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। স্থির করলাম, আমার জীবনের মেয়াদ চুকিয়ে তাকে অব্যাহতি দিয়ে যাব যাতে সে ভারতে গিয়ে যাকে ভালোবাসে তার সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

আমার ঘরে একটা ওষুধের বাক্স ছিল, তার নিচের দিকে বোতলে করে এমন একটা ভারতীয় ভেষজ রেখেছিলাম যা অব্যর্থ মৃত্যু এনে দেয়। আমি বাক্সটা খুলে দেখলাম অন্য জিনিষের সঙ্গে সেটা সেখানেই আছে।

তারপর আমি আমার স্ত্রীকে চিঠি লিখতে বসলাম। লিখলাম, আমি তার বিশ্বাসহীনতার কথা জেনে ফেলেছি এবং শিঘ্রি একদিন সে মুক্তি পাবে আর যাকে সে ভালোবাসে ভারতে গিয়ে তাকে বিয়ে করতে পারবে।

আমি আমার উইলটা বের করে সযত্নে পড়ে দেখলাম তার মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কি না যাতে আমার সম্পত্তি পেতে এ্যাগনিসের কোন অসুবিধে এবং উদ্বেগ ভোগ করতে না হয়।

আমি ভাবলাম, সেই লোকটা হয়তো দরিদ্র। আমি যদি নিজেকে উৎসর্গ করি তা হলে হয়তো সব দিকেই ভালো হয়। হ্যাঁ, ঠিক তাই, সে কাঙ্ক্ষিত সব কিছু পাবে—এই তিন বছর সে যে-সুখের জন্যে অপেক্ষা করেছে তা সে পাবে।

আমি যখন লিখতে ব্যস্ত ছিলাম নিজের ঘরে এ্যাগনিসের চলাফেরা করার শব্দ শুনতে পেলাম।

আমি ভাবলাম, ও বোধহয় ঘুমুতে পারছে না। হয়তো স্নায়ু-বিকলতায় আক্রান্ত হয়েছে আর একবারে ভেঙে পড়েছে। যাই হোক আমি মারা গেলে সব কিছু সে পাবে এই আমার শান্তি।

তারপর তাকে দরজা খুলতে শুনলাম। আমার ঘরের দিকে আসছে। যখন সে আমার দরজায় ধাক্কা দিল তখন আমার লেখবার ডেস্ক বন্ধ করবার মতো অল্প সময়ই ছিল।

আমি দরজায় গিয়ে দেখলাম একটা র‍্যাপার কোন রকমে গায়ে জড়িয়ে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে।

সে বলল, আর্থার তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আমি ভীষণ অশান্তিতে ভুগছি। তুমি কি তোমার ওষুধের বাক্স খুলে আফিমের আরকটা একটু দিতে পার তা হলে বোধহয় একটু স্বস্তি পেতে পারি।

আমি কোন কথা বলি নি। দরজাটা খোলা রইল। সে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে আমার ওষুধের বাক্সের কাছে চলে এল ; বাক্স খোলা দেখে নিজের যন্ত্রণা ভুলে জিজ্ঞাসা করল, আর্থার —আর্থার তুমি কি অসুস্থ ? আমাকে ক্ষমা করো আজকাল আমি স্বার্থপর হয়ে গেছি। আমার প্রতি তোমার ব্যবহারে আমি আহত হয়েছিলাম এখন বুঝতে পারছি তুমি অসুস্থ—সম্ভবত খুবই অসুস্থ। আমাকে ক্ষমা করো প্রিয়তম !

তাকে দু হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে চাইছিলাম কিন্তু পারলাম না —সাহস করলাম না। নিজের গলার স্বরের ওপর আমার বিশ্বাস ছিল না। হয়তো গলার স্বর জড়িয়ে যেতে পারে—হয়তো আমি ভেঙ্গে পড়তে পারি। ভাবলাম, আমার যা বলার কাল সকালে আমার চিঠিই বলবে। এখন আমি যা জানি, কাল সে তাই জানতে পারবে।

আমি তাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিলাম --হয়তো পশুর মতো জোর দিয়ে আমাদের এই যন্ত্রণাদায়ক সাক্ষাতের সময় ছেঁটে দিতে চেয়েছিলাম। ওষুধের বাক্স থেকে ছোট বোতলটা তুলে তার হাতে দিয়ে আমি ফিরে গিয়ে ডেস্কের চেয়ারে প্যাড নিয়ে বসে চিঠি লেখার কাজ সুরু করলাম।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৃদু পায় সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ; চৌকাঠের ওপর গিয়ে একটু থামল। আমার চোখে চোখ পড়ল। সে বলল, শুভরাত্রি।

আমি বললাম, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

ঝঞ্ঝাট ও বাধা পেরিয়ে আমি আবার চিঠি লেখার কাজ সুরু করলাম। যা লিখেছিলাম সেটা আমার পছন্দ হল না। মনে হল লেখাটা খুব কড়া হয়ে গেছে, তাই ছিঁড়ে আবার নতুন করে লেখা সুরু করলাম। বারবার লেখা-লিখি করতে গিয়ে রাত শেষ হয়ে এল আর আমার কাজটা হল না। আমি ভাবলাম, যাই হোক আর কয়েকটা লাইন লিখলেই হবে। কাজেই কলম নিয়ে আবার তাড়াতাড়ি সুরু করলামঃ বিদায়। আমি সব জানতে পেরেছি। তুমি এখন মুক্ত। সুখি হও।

চিঠিটা খামে ভরে তার নাম লিখে অন্য দু'একটা টুকিটাকি কাজ সেরে নিলাম। ভাবলাম, সে এখন ঘুমুচ্ছে, নিঃসাড়ে তার ঘরে ঢুকে সেই মুখখানা একবার দেখব যা এতকাল গভীর অনুরাগে ভালোবেসে এসেছি। তারপর নিজের ঘরে ফিরব—তখন বাকি কাজটুকু সহজ হয়ে যাবে।

আমি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলাম প্রত্যূষের প্রথম আলো তার বালিশে এসে পড়েছে।

কোন রকমে তার পাশে গেলাম। পাছে আমার কান্না তাকে জাগিয়ে দেয় তাই চোখের জল মুছে আমি ঝুঁকে পড়ে তাকে চুমু খেতে গেলাম। তার ঠোঁট বরফের মতো ঠাণ্ডা।

হায় ভগবান, এ কি ব্যাপার! আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। আমি তার পোষাক ছিঁড়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। আমি তার হাতে, তার মুখে, তার বুকে চুমু খেতে লাগলাম—যতক্ষণ না আমার মাথায় সেই আতঙ্ককর চিন্তাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, সে মারা গেছে।

আপনি সহজেই বুঝে নিতে পারছেন ব্যাপারটা কি ঘটেছিল। উত্তেজনার মুহূর্তে আমি তাকে আফিমের আরকের পরিবর্তে বিষ দিয়েছিলাম যেটা আমি নিজে ব্যবহার করব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম। কেবল একটা জিনিষ আমি ব্যাখ্যা করতে পারি নি, কি করে সেই আতঙ্ককর রাতে আপনার ওখানে গেছিলাম আর মৃতার কর রেখা বিচারের জন্যে আপনাকে নিয়ে এসেছিলাম। অবশ্য কাজটা আমি ভালোই করেছিলাম।

আপনি বলেছিলেন, সে তার একজন আত্মীয়কে ভালোবাসে। সেই আত্মীয়ের ভার বোঝা হয়ে চেপে তার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছিল। যে-লোকটাকে টাকা পাঠাত সে তার নিজের ভাই—কিছু দুষ্কার্য করে ইংলণ্ড থেকে পালিয়েছিল। আমি বেঁচে আছি শুধু তার ইচ্ছেটা পূর্ণ করে যাব বলে। আমি ভারতে গিয়ে তাকে দেখে এসেছি। মরবার জন্যেই ইংলণ্ডে ফিরেছি।

তিন সপ্তাহ পরে কর্ণেল মর্টনের শবযাত্রায় শুধু আমি একলা ছিলাম!

ড্রেকের ড্রাম

আমি প্রায়ই ড্রেকের ড্রামের গল্প শুনেছি। ইংলণ্ড কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার আগে ডেভনের শান্ত নির্জন রাত্রের পথে-পথে ড্রেকের ড্রামের বাজনা শোনা যায়। এর অর্থ, জনসাধারণকে অস্ত্র ধরবার আহ্বান।

আমি গল্পটা বিশ্বাস করি নি। ভেবেছিলাম, প্লাইমাউথের পেছনে মেঠো-জমির চাষিদের কল্পনা। ব্যক্তিগতভাবে অদ্ভুতভাবে এ রকম একটা ঘটনার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল।

এই ধরনের একটা গল্প চালু আছে, এলিজাবেথের রাজত্বকালে স্পেনীশ আর্মাডার আক্রমণের সময়, এ্যাডমিরাল ড্রেক প্লাইমাউথ পোতাশ্রয়ের কাছাকাছি, সব লোকালয়ে প্রত্যেক রাত্রে একদল নাবিক পাঠাতেন, তারা ড্রাম বাজিয়ে লোকদের সতর্ক করে দিত, ইংলণ্ড বিপদাপন্ন। দেশের মানুষকে তারা আহ্বান জানাত, ড্রেকের বাহিনীতে যোগ দিয়ে বিপন্ন ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করে তুলতে।

ডেভনের ইতিবৃত্তে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেকের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। ক্রাউনডেলের শান্ত গ্রাম এলাকায় তার জন্ম। খুব অল্প বয়েসে মাস্তুলের কাজ নিয়ে সমুদ্রে-যাওয়া বালক বড়ো হয়ে একদিন স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নায়কত্ব দেন। গোল্ডেন হাইণ্ড জাহাজে চড়ে প্যাসিফিকের দূরদূরান্তে পাড়ি দেন। তারপর প্লাইমাউথে ফিরলে রাণী এলিজাবেথ নিজে তার বিখ্যাত জাহাজে গিয়ে তাকে নাইটহুড দিয়ে সম্মানিত করেন।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, ডেভনের লোকেরা এমন একজন লোককে আজো স্মরণ করে। এতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে, ডেভনের অধিবাসীরা যদি সেই মানুষটার কথা মনে করে, যিনি চাইতেন তার নাবিকেরা ডেভনের পথে-পথে ড্রাম বাজিয়ে বেড়াক!—যারা সেই আহ্বান একবার শুনত তারা কেউ অমান্য করতে পারত না।

অনেকের মতো আমিও শুনেছি, নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের আগে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধের আগে ড্রামের শব্দ শোনা গেছিল। প্লাইমাউথ বন্দর থেকে যারা বউ কিম্বা প্রণয়িণীকে রেখে জাহাজ ভাসিয়েছিল তারা আর ফেরেনি।

শুনেছি, ইদানিং কয়েক বছরের মধ্যে বুয়র যুদ্ধের আগে ড্রেকের ড্রাম বেজে উঠেছিল। উনিশ শ' চোদ্দ সালের মহাযুদ্ধের আগে সুখ-শান্তির দিনগুলোতে লোকে ভাবছিল, কি জানি আবার কবে ড্রেকের ড্রাম শোনা যাবে!

সেই নিয়তি নির্দিষ্ট বছরের প্রথম বসন্তে ঘটনাক্রমে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়োয় হো-র দিকে মুখ-করা কুইন্স হোটেলে দিন কয়েক ছিলাম।

জানালার বাইরে তাকিয়ে, চাঁদের আলোয় বাঁধ-ভাঙা সেই রাতে মনের মধ্যে মানুষের জন্যে শুভেচ্ছা আর সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছু আসতে পারে না। পাড়ের কাছে ভেতরের দিকে ইংলণ্ডের বিশাল নৌবহর নোঙর করা ছিল। মাস্তুলের ছায়া আর উঁচুতে বসানো কামান ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

আমার অজান্তে মন চলে গেল অতীতের সেই দুপুরে, যখন এ্যাডমিরাল ড্রেক ও হোয়ার্ড ক্রিকেট খেলছিলেন ঐতিহাসিক হো-তে। এমন সময় খবর এল, ইংলিশ চ্যানেল ধরে স্পেনের আর্মাডা আসতে দেখা গেছে। ড্রেক খেলা না থামিয়ে বললেন, অনেক সময় হাতে আছে, স্পেনীয়দের আচ্ছা মতো ঠ্যাঙানি দিয়ে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেব।

আর তিনি করেছিলেনও তাই।

বাইরের শান্ত দৃশ্য থেকে সরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম! আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। দু'টোর কাছাকাছি জেগে উঠে দেখি চাঁদ দিগন্তে ডুবে যাচ্ছে। রাত্রির গভীর নৈঃশব্দ্যে পাহাড়ের চূড়োর নিচে যে মৃদু ঢেউগুলো ভেঙে পড়ছে তার শব্দ যে কেউ শুনতে পারে। সেই সঙ্গে

আরেকটা শব্দ, মনে হচ্ছিল, আমার জানালার নিচে শব্দটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর ওঠা-নামা করছিল।

পাশের ঘর থেকে আমার স্ত্রী এসে বললেন, তিনিও শব্দটা শুনেছেন।

কি হতে পারে বলো তো ? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

হেসে বললাম, আমাদের উত্তেজিত কল্পনা নিয়ে ড্রেকের সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম ; কাজেই এটা হয়তো স্বাভাবিক তার ড্রামের আওয়াজ শুনতে পাব।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, সম্ভবত মস্তিষ্কের অবচেতনার কোন কারচুপি ! তখনও কিন্তু ভাবতেও পারি নি পরের দিন রাত্রে আমরা অন্য ভাবে একই ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হব—যা আমাদের যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

পরের দিন আমরা সপ্তাহ শেষের ছুটি কাটাতে গেলাম ডার্টমুরের কাছে আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে।

এই ভদ্রলোক, এ্যাডমিরাল রিচার্ডসন ও তার স্ত্রী আর তাদের পূর্বপুরুষরা এখানকার তিনশ' বছরের বাসিন্দা। এই বংশের সকলেই কোন-না-কোন ভাবে রয়্যাল নেভীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তাঁরা যে বাড়িতে থাকেন—ফলের বাগিচা দিয়ে ঘেরা এলোমেলো ধরনের গোলাবাড়ি যা কেবল মাত্র ইংলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে দেখা যায়। বাড়িটা ড্রেকের আমলে তৈরি—আর এমন একজন ক্যাপ্টেনের যিনি ড্রেকের সঙ্গে সাত সমুদ্দুরে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন।

সামনের দিককার খোলা জানালা দিয়ে যে-কেউ শহর আর তার নিচেই প্লাইমাউথ পোতাশ্রয়—দূরে ছড়ানো ইংলিশ চ্যানেলের বিস্তৃতি দেখতে পারে। বাড়িটা প্রধান সড়ক থেকে একটু সরে আছে—মূল রাস্তার সঙ্গে তার সংযোগ একটা প্রাইভেট রাস্তা দিয়ে। সম্পূর্ণ রকমে বিচ্ছিন্ন ও অত্যন্ত নির্জন জায়গায় বাড়িটার স্থিতি।

মোটরে গিয়ে আমরা প্রায় পাঁচটা নাগাদ পৌঁছলাম। এ্যাডমিরাল ও তার পত্নী উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। এ্যাডমিরাল দম্পতির একমাত্র

মেয়ে ইভলীন ও তার ফিঁয়াসে ক্যাপ্টেন মরিসন বললেন, আমরা একটু পরে চা খেতে আসছি।

ডেভনে এপ্রিল মাসের বিকেলেও কনকনে ঠাণ্ডা। আমরা জ্বলন্ত ফায়ার প্লেসের পাশে বসতে-না-বসতে এ্যাডমিরাল চিমনির পাশে ঝোলান ড্রেকের তৈলচিত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমাদের বিমূঢ় করে বললেন, প্রিয়বন্ধু, ইভলীন ভেতরে এলে স্পেনের আর্মাডা অথবা সে-সব দিনের বিষয় নিয়ে আলোচনার মোড় ঘোরাবেন না। বিশেষ করে ড্রেকের ড্রামের বিষয় উল্লেখ করবেন না। ইভলীন বলেছে, গত রাত্রে সে দ্বিতীয়বার ড্রেকের ড্রামের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। তার পর থেকে তার হিষ্টিরিয়া হবার দাখিল।

আমি আর আমার স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো বলে ফেললাম, আমরাও গত রাত্রে হো-র দিকে আমাদের জানালার নিচে শুনেছিলাম। ভেবেছিলাম, ওসব আমাদের কল্পনা। আপনি কি বিশ্বাস করেন, ইংলণ্ড কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার আগে এ রকম ব্যাপার ঘটে ?

গল্পটা হালকা ভাবে না নিয়ে, কেউ যেন শুনতে না পায় এমন ভাবে ফিসফিস করে এ্যাডমিরাল বললেন, প্রিয় বন্ধু, পৃথিবীতে ঘটে-যাওয়া অনেক রহস্যময় ঘটনার মতো এ ব্যাপারেরও কোন ব্যাখ্যা নেই। ড্রেকের ড্রামও সেই রকম একটা ব্যাপার। এ-রকম-একটা কিংবদন্তী চালু আছে, যদি পর পর তিন রাত কেউ এরকম কিছু শোনে তাহলে অল্প দিনের মধ্যে এমন কাউকে তার সমুদ্রে হারাতে হবে—যাকে সে সবচেয়ে ভালোবাসে !

এ বাড়িতে ইভলীনই একমাত্র, যে গত রাত্রে দ্বিতীয় বার ড্রামের শব্দ শুনেছে।

যদি আজ রাত্রে সে আবার শুনতে পায় তা হলে বুঝতে হবে ইংলণ্ড শিগ্রি কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে আর ইভলীনের ফিঁয়াসেকে জীবন দিয়ে তার দাম দিতে হবে।

ইভলীন আর সেই যুবককে ভেতরে আসতে দেখে আমরা আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিলাম।

ক্যাপ্টেন মরিসনের চাল-চলনে নাবিকের যথার্থ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে। তার নীল চোখে উজ্জ্বল সমুদ্রের বিস্তার। তার হাসিটা সংক্রামক—। ভয় কাকে বলে জানে না—হয়তো কোনদিন জানবেও না। সে ছিল সেই বৈশিষ্ট্যের প্রতীক যা ব্রিটিশ নৌবহরকে বর্তমান মর্যাদায় নিয়ে এসেছে—এবং যা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ!

কেউ দেখলে বুঝতে পারত মরিসন ইভলীনকে পাগলের মতো ভালোবাসে—ইভলীনের ভালোবাসার ধরণও একই রকমেব। এই ভালোবাসাই বুঝি পৃথিবীকে স্বর্গ করে তুলেছে!

সাবেকি ধরনের ডাইনিং রুমে চমৎকার খাওয়া-দাওয়া হল। আলোচনা চলল, প্রধানত কাল আমার ও আমার স্ত্রীর মোটরে করে প্লাইমাউথ যেতে চারপাশে যে-সব দ্রষ্টব্য বিষয় পড়বে সে সব সম্পর্কে।

ক্যাপ্টেন মরিসন সাবমেরিন সম্পর্কে সাধারণভাবে আশ্চর্য করবার মতো অনেক কথা বলল কিন্তু তার নিজের ডুবোজাহাজ সম্পর্কে একেবারে নীরব। রাত্রি এগারোটা নাগাদ সে উঠল, মাঝরাত্তির থেকে তার ডিউটি। আমরা দেখলাম, সে দরজা পার হয়ে যাচ্ছে—তারপর জ্যোৎস্না রাতে তার মোটর প্লাইমাউথের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইভলীন কিন্তু ক্রমশ চুপ মেরে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ম্যান্টল পীসে রাখা জাহাজের ক্রোনোমিটার থেকে কিছুতে চোখ সরিয়ে রাখতে পারছে না।

এ্যাডমিরালও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন তাই বিশেষভাবে চেষ্টা করে তাকে আলোচনার মধ্যে টেনে এনে মাঝরাত্তিরের পরেও ডুবিয়ে রাখলেন। অবশেষে ঘড়িতে একটা বাজল। তখন এ্যাডমিরালের পোড়-খাওয়া মুখে সন্তুষ্টি সূর্যালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ইভলীনের দিকে ফিরে তিনি হাসলেন, খুকুসোনা আমরা সবাই কল্পনাপ্রবণ নিরেট বোকা! আজ রাতে আর কিছু হবে না—আমাদের সবার ঘুমুতে যাবার সময় হল এবার!

ইভলীন কোন উত্তর দিল না। তার চোখ দুটো ম্যান্টল পীসের ওপরে

রাখা ড্রেকের তৈলচিত্রের ওপর স্থির হয়ে রইল! হঠাৎ খাড়া হয়ে সে চেয়ারে বসল, তার হাত দারুণ কাঁপতে লাগল।

বাইরের আবহাওয়া পালটে গেছে ; গাঢ় ধূসর মেঘ চাঁদকে ঢেকে ফেলেছে। সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা দমকা বাতাস উঠে এসে প্রাচীন বাড়িটার জানালায় খটাখট আওয়াজ তুলে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ইভলীন চেয়ার থেকে লাফিয়ে জানালার কাছে ছুটে গেল। তাকে দেখে মনে হল ভয়ানক কিছু একটা ঘটতে চলেছে। সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু শুনতে চেষ্টা করছে।

আমি ভেতর থেকে বুঝতে পারছিলাম, তার জন্যে কী প্রচণ্ড আঘাত আসছে! সুখী হতাম, যদি আমার জীবনের খানিকটা দিয়েও তাকে এই আঘাত থেকে বাঁচাতে পারতাম। নিবিড় ভালোবাসা দিয়ে জড়ানো তার অলৌকিক মানসিকতা হয়তো আমাদের আগেই শুনতে পেয়েছিল। আমাদেরও বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি।

অনেক দূরে প্রসারিত মাঠের দিগন্ত থেকে সেই আওয়াজটা ভেসে এল—ড্রামের ভারী গড়িয়ে যাওয়া আওয়াজ ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। শব্দটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। মনে হল, বড় রাস্তা ছেড়ে এই বাড়ির নিজস্ব পথ ধরে সোজা এগিয়ে আসছে। ইভলীন যে জানালায় দাঁড়িয়েছিল তার নিচু দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে, পথ বেয়ে ফলের বাগানের দিকে এগিয়ে মিলিয়ে গেল।

আমরা ইভলীনের কাছে পৌঁছবার আগেই সে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এই নিয়ে বার বার তিনবার সে ড্রেকের ড্রামের বাজনা শুনতে পেল।

কয়েক মাস পরে, ১৯১৪-র আগস্টে ব্রিটেনে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল। আহ্বান এল, অস্ত্র ধরবার। ক্যাপ্টেন মরিসনের সাবমেরিন ধ্বংস হল। ক্যাপ্টেনের দেহ উদ্ধার করা যায় নি। সমুদ্র-জননী তার সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে ড্রেকের ড্রামের কিংবদন্তীর সত্যতা আবার প্রমাণ করলেন।

ম্যাক্সিমিলিয়ান দেলমেরের অন্তর্ধান

কার্ল ল্যাণ্ডর অস্ট্রিয়ার অধিবাসী। যুদ্ধের আগেকার প্যারিসের সবচেয়ে আলোচিত ভাস্কর। বয়েস হবে তার বছর তিরিশেক; চূড়ান্ত রকমের খামখেয়ালি। আর চেহারা সম্পর্কে বলা যায়, কখনো-কখনো মনে হয় বুঝি অত্যন্ত কুৎসিৎ।

যখন কাজ করার প্রেরণা পেত না তখন তার চেয়ে কুঁড়ে লোক কল্পনা করা যায় না। দিনের পর দিন এমন কি মাসের পর মাস স্টুডিওতে বসে হাসিস টেনে যাচ্ছে অথবা ল্যাটিন কোয়ার্টারের কোন কাফের এক কোণে বসে মদ খেয়ে যাচ্ছে।

যখন সে কাজ করত তখন একেবারে বিপরীত—সারা সপ্তাহ ধরে একনাগাড়ে দিন-রাত পাগলের মতো মডেলের কাজ করে যাচ্ছে।

তার বিশাল স্টুডিওটা গারেঁ মঁপারনস্ থেকে বেশি দূরে নয়, তবে এতো নোংরা যে দেখলে মনে হবে কোন পাগলা গারদ। সারা জায়গাটা জুড়ে খোদাই করা মূর্তি ছড়ানো। মাটির মস্ত বড়ো-বড়ো সব মডেল অদ্ভুত সব জায়গায় দাঁড় করানো রয়েছে।

কার্ল ল্যাণ্ডরের বিশেষত্ব হচ্ছে সাদা পাথরে সুন্দরী নারী-মূর্তি রচনা—সে ছিল নগ্নতার একনিষ্ঠ পূজারী।

সে মডেল খুঁজে-খুঁজে হন্যে হয়ে গেছিল। প্যারিসের যে-কোন শিল্পীর চেয়ে মডেলকে সে বেশি টাকা দিত। শেষে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ত ফলে কোন মডেলই তার কাছে দীর্ঘ সময় ধরে পোজ দেবার জন্যে অপেক্ষা করত না।

কখনো-কখনো কার্ল ল্যাণ্ডর অসাধারণ কাজ করত। ভেঙে ফেলবার আগে কোন ডিলার যদি তার কাজ হাতিয়ে নিতে পারত তা হলে তার থেকে নিশ্চিতভাবে মোটামুটি কিছু রোজগার হয়ে যেত তার।

ল্যাঙার অবশ্য গ্রাহ্যই করত না তার সৃষ্টি বিক্রি হল কি কাউকে দিয়ে দিল।

স্বভাবতই এ ধরনের লোক সব সময় ঋণে ডুবে থাকে। এ নিয়ে তার নিজের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। প্যারিসের লাতিন কোয়ার্টারে একজন শিল্পী তার দেনার জন্যে যতোখানি সম্মান পেত লিজ্‌ঁ ড্যানারের জন্যে ততোখানি সম্মান পেত না।

কার্ল ল্যাঙর একটা মাত্র ব্যাপারে উদ্বেগ বোধ করত যে তার মডেলদের বেশি টাকা দিতে হবে। আর তাদের দেবার জন্যে নতুন করে পাওনাদারদের কাছে টাকা ধার করত। সে ছিল একান্তভাবে সৎ। যদি তার মূর্তি কোন ডিলার বা কোন আর্ট গ্যালারি কিনত তবে তার প্রত্যেকটা পয়সা দেনা শোধ করবার জন্যে বরাদ্দ করে রাখত। দেনা শোধ দেবার পর যদি কিছু থাকত তো ভালো, না হলে আগের মতোই দিন কাটাত।

এ রকম একজন পাগলাটে শিল্পী সম্পর্কে আমি যে কোন কৌতূহল বোধ করব সে কথা কল্পনাই করতে পারি নি। তার সঙ্গে আমার একজন ফরাসী শিল্পী বন্ধুর প্যারিসের বাড়িতে কালে-ভদ্রে দেখা হত। ফেরবার পথে সে তার নিজের স্টুডিওতে আমাকে নিয়ে গিয়ে হালফিল যে মূর্তি গড়েছে তাই আমাকে দেখাত। তার সবে শেষ হওয়া প্লাষ্টার অব্ প্যারিসের তৈরি সুষমাবলয়িত পূর্ণাবয়ব নগ্ন নারীমূর্তি দেখে নিঃসীম আনন্দ পেয়েছিলাম। মডেলিং-এর এমন নিখুঁত কাজ এ-পর্যন্ত আমি দেখি নি।

আমার প্রশংসা শিল্পীর মনে কোন রেখাপাত করল না। বরং সে ঠাণ্ডা গলায় আমাকে বলল, তুমি সেই সব নির্বোধদের মতো যারা বাইরেটা দেখে বিচার করে। দেখতে পাচ্ছ না মূর্তিটার কোন আত্মা নেই।

আর কথা না বলে ল্যাঙর একটা হাতুড়ি তুলে মূর্তিটাকে এক ঘায়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলল। তার ধ্বংশের উচ্ছৃঙ্খল কাজ-কারবার দেখে আমার চোখে জল এসে গেছিল প্রায়। হয়তো বেসামাল

কিছু বলে ফেলার জন্যে এমনটা ঘটেছে ভেবে নিজেকে দোষ দিতে লাগলাম। শান্ত ভাবে তার হাতটা আমার কাঁধের ওপর রেখে বলল, মন্-আমি কয়েকদিনের মধ্যেই তোমাকে দেখাব স্নুন্দরী নারীর আত্মা কি! খুব কম মহিলারই আত্মা আছে সেই জন্যেই তাদের এত কুৎসিৎ দেখায়—সেই জন্যেই তারা মুখে তেল চিটচিটে রঙ আর পাউডার লাগায়। কিন্তু তাদের চোখ—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সেগুলো তারা পালটাতে পারে না—অন্তত বেশি তো নয়। যদি পারত তা হলে অন্ধ মেয়েমানুষের জাত এর আগেই তৈরি হয়ে যেত।

বিশ্বাস কর বন্ধু। মেয়েদের হৃদয় যদি নিষ্পাপ হয় তা হলে তারা লুকিয়ে রাখতে পারে না। তার অবয়বের প্রতিটি রেখায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দূর আকাশপারের তারার আলো তাদের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যা পুরুষকে স্বর্গের পথ দেখায়।

সেই রকম একজন মহিলাকে আমার খুঁজে পেতে হবে—তার জন্যে যদি আমাকে সারা পৃথিবী ঢুঁড়তে হয় তাতেও আমি পিছ-পা নই। যখন খুঁজে পাব—তোমাকে খবর দেব—তখন তুমি বুঝতে পারবে আমি কি বলতে চাই!

কার্ল ল্যাঙর কয়েকমাস বাদে আমাকে ডেকে পাঠালেন।

একটি জীবন্ত মডেল স্টুডিওর একধারে সিংহাসনের মতো কিছু একটার ওপর বসে আছে।

যে-মেয়েটাকে সে পেয়েছে তার সৌন্দর্য বর্ণনার চেষ্টা আমি করব না। শব্দ দিয়ে তার যথার্থ বর্ণনা করা যাবে না। জঙ্গলের কোন অজ্ঞাত পরিচয় দেববিভূতির পরিচয় দিতে যাওয়া আমার পক্ষে বাতুলতা ছাড়া আর কি!

সত্যি সে একটা মেয়ে খুঁজে পেয়েছিল—যার ভিতরে আত্মা আছে, আর যে-কেউ সেই আত্মা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারত। তার চোখ থেকে চন্দ্রালোকের মতো স্নিগ্ধতা ঝরে পড়ছিল। আর তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হাসিতে ঠিকরে যাচ্ছিল ভালোবাসা আর সৌন্দর্য।

আমি ল্যাঙরের দিকে তাকালাম। কী আশ্চর্য তার পরিবর্তন—তার মুখে যা কিছু অশোভনতা ছিল সব যেন নিঃশেষে মুছে গেছে! তার শিল্পীসত্ত্বা অবশেষে খুঁজে পাওয়া সেই নিখুঁত মানবীর মধ্যে নিজেকে আত্মস্থ করল। আমি অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি কোনখান থেকে এ এল!

আমরা কখনো আমাদের মডেলদের ইতিহাস জানাতে চাই না। কার্ল ল্যাঙর উত্তর দিল, আমার কাছে এই মেয়েটি গ্রীক মন্দিরের উৎসর্গীকৃতা নারীদের জন্মান্তরের কেউ। কানের কাছে সে ফিসফিস করল, একেবারে অপাপবিদ্ধা!

আমি সাহস করে বললাম, প্যারিসে কাউকে তুমি তেমন আশা করতে পার না।

তার মুখে ঈর্ষার আগুন ঝলসে গেল, যতদিন তার দিকে আমার নজর থাকবে ততদিন সে তাই থাকবে। কার্ল ল্যাঙর প্রায় সাপের মতো ফুঁসে উঠল।

আমরা দু'জন স্টুডিওর অন্যধারে সরে গিয়ে বাঘের চামড়া দিয়ে ঢাকা একটা ডিভানের ওপর গিয়ে বসলাম। ওপরের একটা জানালা দিয়ে রোদের আলো এসে মেয়েটির সোনালি চুলের রাশে ও পিঠের ওপর-নিচে পড়েছে। নকল সিংহাসনে এই অজ্ঞাত মেয়েটি মুহূর্তের জন্য সম্রাজ্ঞীর গরিমা ও উজ্জ্বল ঐশ্বর্যে দীপ্তি পেতে লাগল। তারপর রোদের আলো যখন মুছে গেল—তখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্বপ্ন দেখছিলাম না তো!

আমি জিজ্ঞাসা না-করে পারলাম না, কোথায় একে পেলে?

আমি একে পাই নি—এ-ই আমাকে খুঁজে পেয়েছে!

কার্ল ল্যাঙর বলল, একদিন সকালে এসে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করল,কোন কাজ-টাজ এখানে পাওয়া যাবে? এর আগে কখনো মডেলের কাজ করে নি। বেচারা চমকে উঠেছিল যখন আমি বললাম আমি কেবল মাত্তর নিউড্‌দের নিয়ে কাজ করি। বোধহয় ওর ক্ষিদের জন্যেই আমার সুবিধে হল—রাজি হয়ে গেল আমার কথায়। মাস তিনেক ধরে আমার জন্যে মডেল হয়ে পোজ দিচ্ছে।

বেশ কিছুকাল ধরে আর ল্যাগুরের দেখা পাচ্ছিলাম না। ইতিমধ্যে সেই সুন্দরীকে মডেল করে যে-সব মূর্তিকে সে রূপ দিয়েছিল তাই নিয়ে সারা প্যারিস জুড়ে তুমুল সাড়া পড়ে গেছিল। ডিলাররা এর জন্যে যে-কোন মূল্য দিতে রাজি ছিল—আর ল্যাগুরও ফলে বেশ ধনী হয়ে উঠেছিল।

বছর খানেক এরপর পার হয়ে গেছে। ল্যাটিন কোয়ার্টার, মমার্তের সঙ্গে মিলে বার্ষিক 'ফোর আর্টস বলের' প্রস্তুতির আয়োজন শুরু করে দিয়েছিল।

সে বছর (১৯১৪) 'কোয়ার্টারস আর্টস'-এর সমারোহ অন্য বছরের চেয়ে বড় করে করার ব্যবস্থা হচ্ছিল। প্রত্যেক স্টুডিও তাদের সব সুন্দরী মডেল দিয়ে সাহায্য করতে অঙ্গীকার করেছিল। মঞ্চের ওপর অদ্ভুত সব মূর্তির পরিকল্পনা করা হয়েছিল—প্যাগানদের বর্বরতা ও ঐশ্বর্য-বিলাসের দৃশ্যাবলী চারদিকে সাজানো হয়েছিল—নগ্ন বর্বরের দল তীর-ধনুক ও বর্শা নিয়ে দিগ্বিজয়ী রোমান, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। দাস-বাজারে নিলামে বারাঙ্গনা মডেলদের হাজির করা হবে—দিগবসনা মহিলাদের রথের চাকার সঙ্গে বেঁধে, রোমের বিজয় তোরণের ভিতর দিয়ে তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এটা হবে একেবারে নগ্নতার উৎসব আর দেবতা ব্যাকাস তার সিংহাসনে চড়ে হাজির থাকবেন।

কার্ল ল্যাগুরই সম্ভবত একমাত্র শিল্পী যে উৎসবের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হয় নি।

অবশেষে উৎসব রজনী এসে হাজির হল। মুলাঁ রুজে যাবার সমস্ত পথ দাঁড় দিয়ে আটকে দেওয়া হল যাতে বিনা টিকিটে কেউ 'রেড মিল'-এলাকার দিকে এগোতে না পারে।

নানা ধরনের ঘোড়ার গাড়ি আর মোটর গাড়ি থেকে মজা লুঠনেওয়ালা অঢেল মানুষের ভিড় উপচে পড়তে লাগল।

রোমান মল্লযোদ্ধাদের বেশে সজ্জিত পুরুষেরা এল ; সঙ্গে শুধু মাত্র সাণ্ডেল-পরা নগ্ন ক্রীতদাসীর দল। সোনালি রথ বেরিয়ে আসতে লাগল কাছাকাছি স্টুডিও থেকে, তার ওপর নানান আকৃতি-প্রকৃতির মডেল। ব্যাণ্ড-বিউগিল বেজে উঠল। বৈদ্যুত-আলো দিনকে রাত করে তুলল। মুঁলা রুজেঁর নিষিদ্ধ দরজাগুলো নরকের মানুষ-মডেল বাজনা সব গ্রাস করে ফেলল।

ভেতরের বিশাল নাচের জায়গাটা তামার পাতের মতো ঝকঝক করছে। বসবার ঘেরা জায়গাগুলো গোলাপ দিয়ে সাজানো যেখানে জলের মতো শ্যাম্পেনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত সব মঞ্চগুলো ভেতরে এনে জীবন্ত সব মালপত্তর—(পুরুষ ও নারী ; তাদের কেউ পোশাক পরা, কেউ বা স্বল্পবাসে ঢাকা। কারো শরীরে পোশাকের লেশ মাত্র নেই !) খালাস করতে লাগল। তাদের সবাইকে নিদারুণ এক পাগলামির হাওয়ায় পেয়ে বসেছিল—ফেনিল বুদ্বুদের মতো ঘুরতে ঘুরতে তারা একটা প্রবেশ পথ থেকে আরেকটা প্রবেশ পথে পাক মেরে যাচ্ছিল যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে ধুঁকতে-ধুঁকতে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ছিল।

রাত দুটোর সময় একটা ঘণ্টা বাজল। তখনও যাদের সামান্য শালীনতা বোধ ছিল তারা সেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

আধ ঘণ্টা বাদে আবার ঘণ্টা বাজল।

এবার যথেচ্ছাচার চূড়ান্ত পাগলামির পর্যায় পৌঁছে জাঁকিয়ে বসল।

সবাই বাতাসে জামা-প্যান্ট উড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আমরা শিল্পী—আমরা কোন অন্যায় করি না !

আর্টের নামে অশোভনতার সামান্য পর্দাটুকুও রইল না। এই রকম একটা পাগলামির ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে কালো পোশাক পরা একটা লোককে সম্ভবত বল-রুমের দিকে পথ করে নিতে দেখা গিয়ে থাকবে। শিল্পী না হলে সে বোধহয় ভিতরে ঢুকতে পেত না। পরিচারকরা দেখেই চিনতে পেরেছিল—ইনি হচ্ছে ল্যাটিন কোয়ার্টারের সবচেয়ে আলোচিত স্থপতি কার্ল ল্যাঙর।

একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে বলরুমের নাচ ও পানোৎসবের জমাট হৈ-হল্লার মধ্যে কাকে যেন খুঁজছিল!

কার্ল ল্যাণ্ডর মেয়েদের ভালো করেই জানত; আর এও জানত যে খোসামুদি আর অসার শ্লাঘা এই দুই দুষ্টু পরী তাদের ধ্বংসের সীমানায় ঠেলে দেয়!

কার্ল ল্যাণ্ডর ভেবেছিল, এটা কি সম্ভব—ম্যারিয়ান প্যারিসের সেরা মডেল হিসেবে নিজেকে দেখাতে প্রলুব্ধ হবে! অবশ্য তার জানা ছিল যে খোসামুদে প্রশংসায় ভরা সনির্বন্ধ অনুরোধ নেমন্তন্নের চিঠি হয়ে ম্যারিয়ানের কাছে এসেছে। গত এক বছর ধরে সে দিনের পর দিন শিল্পীর সামনে বসে পোজ দিয়ে যাচ্ছে—এ ছাড়া তার জীবন নিস্তরঙ্গ ভাবে বয়ে গেছে। কার্ল ল্যাণ্ডরের অবশ্যই জানা ছিল মেয়েদের মানস সরসীর গভীরে কী রকম আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে; উপরের জল তল দেখে কোন পুরুষই তা ধারণায় আনতে পারে না।

খোঁজ করে অন্য এক পরিচারকের কাছ থেকে জানতে পারল, মাঝরাতের একটু আগে ম্যাদামোয়াজল বন্ধ একটা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বেরিয়ে গেছেন।

হৃদয়ে যন্ত্রণা আর মাথায় আগুন নিয়ে কার্ল ল্যাণ্ডর বলরুমের দিকে এগলো। থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে তার সামনে উচ্ছ্বসিত হয়ে দ্রুত বেগে সরে যাওয়া নাচিয়েদের দলে তাকে দেখতে পেল না। সার্চ-লাইটের মতো জ্বলন্ত চোখ ফেলে তন্ন-তন্ন করে উপরের দিকের বক্সগুলো খুঁজে দেখল। হঠাৎ সেখানে তুমুল সোরগোল পড়ে গেল! একটা উদোম ন্যাংটো মেয়ে ন্যাকড়ার পুতুলের মতো এক বক্স থেকে আরেক বক্সে চালান হতে লাগল। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল তাকে নিয়ে।

ম্যারিয়ান! চেঁচিয়ে উঠল কার্ল ল্যাণ্ডর, হায় কপাল, আমার ম্যারিয়ান! বাঘের মতো গর্জন করে তার কাছে পৌঁছল ল্যাণ্ডর।

অন্তত এক ডজন মাতাল আমুদের দল তাকে বাধা দিয়েছিল।

ঘণ্টা বেজে গেছে। তারা চেঁচিয়ে উঠল, এখন সব মেয়েই সমান। নিজের গায়ের পোশাকটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কার্ল ল্যাণ্ডর প্রায়

মূর্ছা-যাওয়া সেই মেয়েটিকে নিয়ে একটা বন্ধ গাড়িতে করে চলে গেল।

সেই মুহূর্ত থেকে ম্যারিয়ান দেলর্মের সব চিহ্ন হারিয়ে গেল। মনে হল পৃথিবী তাকে গিলে ফেলেছে। তার এই অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা ল্যাটিন কোয়ার্টারের একমাত্র আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। পরিচারক পুলিশকে শুধু মাত্র এইটুকু খবর জোগাতে পারল, ম্যাডামোয়াজেল মাঝ-রাত্তিরের পরেই একটা বন্ধ গাড়িতে একলা চলে গেছে। যদি ফিরে থাকে তবে সেটা তার জানা নেই।

ল্যাঙুর শান্তভাবে ডিটেকটিভদের জানাল, ম্যারিয়ান তার মডেল ছিল। তাকে বলরুমে দেখে বাইরে নিয়ে এসেছিল; কেন না এসব নারকীয় কাজকর্মে তার অনুমোদন ছিল না। সে যেখানে থাকত সেই মঁপারনাসে তাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। তারপর থেকে তাকে আর দেখে নি।

কর্তৃপক্ষ প্যারিসের আর্টিস্টদের মডেলের ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দেন না। তারা গ্রীষ্মের চাতক। আসে আর যায়। যদি কেউ অদৃশ্য হয়ে যায় তবে তার লাশের হিসেব রাখার জন্যে সীন নদী আছে। আর যদি মৃতদেহ না পাওয়া যায় তবে আর কি করবার আছে!

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ম্যারিয়ান দেলর্মের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা, প্যারিসের আর দশটা রহস্যের মতো সবাই ভুলে গেল।

ঠিক এক মাস পার হয়ে যাবার পর একদিন আমি আর ফরাসি শিল্পী পল লেগ্রি আমাদের বন্ধু ল্যাঙুরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে গাড়ি থেকে নামলাম। আমরা কার্ল ল্যাঙুরের পরিবর্তন দেখে চমকে উঠলাম। অল্প সময়ের মধ্যে তার চুল শাদা হয়ে গেছে, দাড়ি লম্বা হয়ে গেছে—কোন পরিচর্যা নেই। কাপড়-চোপড় ময়লা আর ছেঁড়া-খোঁড়া। মনে হল সে যেন সব কিছুতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে।

তার ডেস্কে দেখলাম, ডিলারদের পাঁজা করা চিঠি, তার এখনকার তৈরি বিখ্যাত কোন মূর্তি পাবার জন্যে বিনীত আবেদন।

তার স্টুডিওতে ম্যারিয়ান দেলর্মের বিশাল মূর্তি ছাড়া আর কোন আর্টের কাজ ছিল না।

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ক্লান্ত আর ভাঙা গলায় কার্ল ল্যাগুর জানাল, ম্যারিয়ান অদৃশ্য হয়ে যাবার কয়েক সপ্তাহ পরে এই মূর্তিটা সে তৈরি করেছে।

আমার স্মৃতিতে তখনও সে বেঁচেছিল। যোগ করল কার্ল ল্যাগুর, এটাই আমার শেষ কাজ। ম্যারিয়ানের মতো মডেল আর আমি পাব না।

ম্যারিয়ানের মূর্তিটা ছিল পূর্ণাবয়ব। কাজটা করেছিল সে নিজের অসামান্য শৈলীতে। প্রথম কাজটা কাদামাটির—তার ওপর প্লাস্টার অব্ প্যারিসের প্রলেপ আর উজ্জ্বলতা এনেছিল তার নিজের উদ্ভাবিত কোন গোপন কৌশলে। দেখতে শ্বেত পাথরের চেয়ে সুন্দর হয়েছে—

তুমি নিশ্চয়ই এটা প্রদর্শনীতে পাঠাবে? আমরা দু'জনেই বললাম, এটা এ বছরের সবচেয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করবে।

কার্ল ল্যাগুর কোন উত্তর দিল না। উত্তর দেবার দরকারও মনে করল না।

পরের দিনই ছিল সাঁজে লিজেঁর চিত্র প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাবার শেষ দিন। লেগ্রী সব ব্যবস্থা করল। তারপর আমি সে আর কিছু লোক মিলে মূর্তিটাকে প্রদর্শনীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম।

ল্যাগুর কোন বাধা দেয় নি। স্টুডিওর এক কোণে জানালার নিচে একটা ডিভানের ওপর সে আধো ঘুমে এলিয়েছিল। কাজটা হয়ে গেলে কাছাকাছি একটা রেস্তোরা থেকে সে লোভনীয় খাবার এনে খাইয়েছিল।

এক সপ্তাহ বাদে বিউক্ চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। ফরাসী

রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট, একাদেমীর সদস্য ও বিউক্ চিত্র প্রদর্শনীর প্রধানদের নিয়ে প্রদর্শনীর ছবি দেখতে সরকারী সফরে এলেন।

স্থাপত্য বিভাগের প্রান্তে ডায়াসের ওপর ল্যাণ্ডরের মূর্তিটাকে সসম্মানে স্থান দেওয়া হয়েছে দেখে আমার আর লেগ্রীর আনন্দের সীমা রইল না।

মূর্তিটার সামনে গিয়ে রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট থামলেন; তারপর আবেগ জড়ানো গলায় প্রদর্শনী কমিটির ল্যাণ্ডরকে সর্বোচ্চ পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন।

তার থেকে আরো বড় সম্মান তার ভাগ্যে ছিল। প্রেসিডেন্ট যখন শুনলেন শিল্পী অসুস্থ এবং মৃত্যুপথ যাত্রী তিনি আদেশ দিলেন, ক্রস্ অব্ দ্য লিজঁ দ্যানার এখুনি তার কাছে পাঠিয়ে তার বুকে পরিয়ে দেওয়া হোক।

এই শুভ সংবাদ ল্যাণ্ডরকে দেবার জন্যে ছুটলাম। ভাবলাম, এতে হয়তো ল্যাণ্ডর আবার বেঁচে উঠতে পারে। আমি একলাই তার স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলাম।

ল্যাণ্ডর কৌচে শুয়েছিল। সম্ভবত তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল; কিন্তু তার চোখ দুটো আগে যেমন দেখতাম, স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল!

তার বিছানার পাশে হাঁটু পেতে বসে কমিটির সিদ্ধান্ত এবং প্রেসিডেন্টের আদেশের কথা পুনরাবৃত্তি করে তাকে জানালাম।

ল্যাণ্ডরের ঠোঁটে আবছা একটা হাসি ফুটে উঠল। ফিসফিস করে বলল, ম্যারিয়ানকে কেমন দেখাচ্ছে? তার আত্মাকে কি তার চোখে দেখেছিলে — না মুছে গেছে?

যখন বললাম, হ্যাঁ, তার আত্মাকে তার চোখে দেখেছিলাম তখন তাকে খুব সুখি মনে হল।

হঠাৎ ল্যাণ্ডর আমার হাত চেপে ধরে আমাকে তার কাছে টেনে নিয়ে বলল, আমার বুকে পিন দিয়ে 'লিজঁ দ্যানারের' ক্রশ চিহ্ন এঁটে দেবার আগে আমার গোপন কথাটা তোমাকে বলতে চাই—"

হাঁপাতে লাগল সে! তারপর ব্যঙ্গের হাসি হেসে দাঁতে-দাঁত চেপে বলল, তারা আমাকে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান দিতে আসছে—আর আসছে একজন খুনিকে দিতে। আমাকে বাধা দিও না—শুনে যাও—।

আমি ম্যারিয়ানকে বলরুমের অপরাধের ঘূর্ণি থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলাম। আমি জানতাম, সে আর অপাপবিদ্ধা নয়—তার চোখে যে আত্মাকে আমি বন্দনা করেছিলাম চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে—তার জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে বাসবদত্তাব মদালসা দৃষ্টি!

এই অবস্থায় তার আত্মাহীন দেহকে বেঁচে থাকতে দেওয়া পাপ! আমি ঠিক সেই হাতুড়ি—ওই যে টেবিলের ওপর পড়ে আছে—ওইটে দিয়ে আমার তথাকথিত আর্টের নিদর্শনগুলো ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দিতে লাগলাম। তারপর হাতুড়ির একটা আঘাতে ম্যারিয়ানের খুলিটা ফাটিয়ে দিলাম।

যখন সকাল হল, ভাবলাম স্টুডিওর মেঝেতে পড়ে থাকা এই প্রাণহীন দেহটার হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে—কিন্তু কী করে, সেটাই হল প্রশ্ন!

তারপর মাথায় একটা বুদ্ধি এল, এই লাশটাকে খাড়া করে তার ওপরে তাল-তাল মাটি চাপা দিয়ে একটা মূর্তি খাড়া করি তা হলে এটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যাবে।

আমি পাগলের মতো কাজ শুরু করে দিলাম আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্টুডিওর মাঝখানে মডেল তৈরি করবার ফাঁকে মাটির একটা পিলার দাঁড়িয়ে গেল—আর কিছু রইল না।

তারপর আমার মনের মধ্যে ম্যারিয়ানের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করবার উন্মাদ বাসনা জেগে উঠল—ঠিক তেমনি কিছু করতে চাইলাম, ম্যারিয়ানকে একমাত্র আমি যেমন জানতাম!

শান্তভাবে অথচ ত্বরিতগতিতে আমি একটা কর্ণিক নিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম। ম্যারিয়ানের সুডৌল মাথার পরিমিতি, তার কাঁধের ওঠা-নামার ছাঁদ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। অবশিষ্ট অংশ সহজেই রূপ পেল। দুপুরের মধ্যেই সবজে মাটি দিয়ে তৈরি ম্যারিয়ান দেলর্মের পূর্ণাবয়ব বিশাল মূর্তি দাঁড়িয়ে গেল।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আমি মূর্তির মধ্যে আত্মার প্রকাশ ঘটাতে লাগলাম—যেমন আমি তাকে জীবন্ত অবস্থায় দেখেছি। বোধহয় তার আত্মা এসে আমাকে সাহায্য করেছিল। আমি স্থিরদৃষ্টিতে তার আশ্চর্য চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটু-একটু করে এগিয়ে গেছি—যতক্ষণ পর্যন্ত না সন্তুষ্ট হয়েছি।

ল্যাণ্ডর, তার রহস্যটুকু আমার কাছে ফাঁস করে বিছানায় এলিয়ে পড়ল। কথা বলার ধকলে তার সামর্থ্যটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছিল।

আমার মন ছুটে গেল, যেখানে বেদীর ওপর মূর্তিটা প্রদর্শনের জন্যে দাঁড়ানো আছে।

দরজায় একটা শব্দ হল। আমি দরজা খুলে দিলাম।

"ক্যমাণ্ডারী অব্ দ্য লিজ্ঁ দ্যানার" এর চ্যান্সেলর স্বয়ং এবং সঙ্গে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। তারা ভেতরে ঢুকলেন। স্টুডিওর প্রান্তে কৌচের চারপাশে সবাই ঘিরে দাঁড়ালেন। চ্যান্সেলর একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। ভাষণে বললেন, মহৎ শিল্পীকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিতে পেরে ফরাসী দেশ আজ গর্বিত!

চ্যান্সেলার যখন ল্যাণ্ডরের সার্টে ক্রশ পরিয়ে দিতে গেলেন—মুমূর্ষু মানুষটি সেটা ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। বোধহয় তার মনের ওপর দারুণ চাপ পড়ে থাকবে—একবার নিশ্বাস ফেলে নিষ্প্রাণ দেহ কৌচে পড়ে গেল।

পরদিন সকালে সারা প্যারিস যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ল।

রাত্তিরবেলা হয়তো বা ভোরের দিকে প্রদর্শনীর পাহারাদারের দল স্থাপত্য বিভাগের দিকে কিছু একটা ভেঙে পড়ার শব্দ শুনতে পায়।

ল্যাণ্ডরের মূর্তিটার দিকে ছুটে গিয়ে তারা দেখতে পেল, মূর্তিটার মাঝখান থেকে চিড় খেয়ে দু' পাশের অংশ খসে পড়েছে আর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ম্যারিয়ান দেলর্মের নগ্ন অবয়ব!

নিম্বভিং কেন বাধ্যতে

একদিন বিকেলের দিকে ন্যু ইয়র্কের ফিফ্‌থ এভিনিউর ঘরে অত্যন্ত সুবেশ এবং রূপবান একজন মানুষ এসে দেখা করে তখুনি একটা 'ইন্টারভিউ' প্রার্থনা করলেন।

সে সময় অবশ্য আমার হাতে কোন কাজ ছিল না কিন্তু একটু পরে কতকগুলো এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল; কাজেই আর সময় নষ্ট না করে আমার টেবিলের ওপর তার হাতটা রেখে এতটুকু ইতস্তত না করে তার অতীত জীবনের ঘটনা বলে যেতে লাগলাম।

অতীতে কোন বছরে কোন তারিখে কী-ঘটেছে তা বলে দেওয়াই আমার রীতি। অতীতে ঘটে-যাওয়া ব্যাপারগুলো ঠিক-ঠিক বলে দিলে মক্কেলদের মনে বিশ্বাস জন্মায়। তা ছাড়া আমি দেখেছি, কোন বিশেষ জিনিস বা ঘটনা ভবিষ্যতের অনেক সংকেত দেয়।

আমার সামনে হাজির হওয়া মানুষটির জীবনে দেখা যাচ্ছে একটি বাসনা অত্যন্ত প্রবল, অর্থ সঞ্চয়ের প্রবল আগ্রহ; ভালোবাসা অথবা ভাবপ্রবণতার কোন ঠাঁই তার জীবনে নেই।

এই সূত্র অনুসরণ করে তার হাত দেখা সহজ হয়ে গেল। ভদ্রলোকের জীবনের কাহিনী যেন হাতের রেখায় নয় অক্ষর সাজিয়ে লেখা। তার বাল্যকালে ছিল নিদারুণ দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য এবং অত্যন্ত প্রতিকূল এবং হতাশ পরিবেশ। কাজেই ধারণা করা যেতে পারে, দৃঢ় সংকল্পের লোকের পক্ষে সেখান থেকে সরে আসা কঠিন।

এসব কথা তাকে বললাম। এ ছাড়া জানালাম, তার স্ব-শিক্ষায় ভয়ঙ্কর পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার একটা অমানুষিক চেষ্টা ছিল; কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে—সেটা অবশ্য তার জলের ওপর মাথা তোলবার চেষ্টা। কয়েক বছর বাদে তার স্ত্রীর মৃত্যু—স্থান পরিবর্তন এবং উন্নতির জন্যে

করে পঁয়তাল্লিশ বছরে আবার ব্যাঘাত। যাই হোক, কোন রকমে জোড়াতালি দেওয়া হয়েছিল। প্রথমবার বিয়ের সময় এমন কিছু করেছিলেন যা, তার জীবনের সাফল্যের মুহূর্তে দেখা দিয়ে উচ্চাভিলাষের পথ আটকে দেবে। হয়তো সৌভাগ্যের সম্ভাবনা নষ্ট করে দেবে, এমন কি তার জীবনও যেতে পারে।

ঈশ্বরের দোহাই, চুপ করুন। ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম কী অসাধারণ যন্ত্রণা তাকে বহন করতে হচ্ছে। আমার বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল।

যে রূঢ় মুখের ব্যঞ্জনা নিয়ে লোকটি ভিতরে এসেছিল এতক্ষণে সে মুখোস খসে পড়ে গেছে আর কপালে মুক্তোর মতো বড়ো-বড়ো ঘামের ফোঁটা দেখা দিয়েছে।

লোকটা যখন এসেছিল তার জন্যে আমার কোন সহানুভূতি ছিল না। শল্য চিকিৎসক রোগীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে তেমনটাই করেছি। এতকাল ধরে একান্ত অভিনিবেশে যে জ্ঞান আয়ত্ত করেছি তার সত্যতা প্রমাণ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল ; কেন না, আমার আবেগ অনুভূতির সঙ্গে জনসাধারণের কোন যোগ ছিল না। তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মক্কেল যারা আমাকে ফি দেয়, সুযোগ পেলে, আমার বিদ্যের ওপর ফক্কুরি করতে ছাড়ে না।

কিন্তু এই লোকটার জন্যে আমার হৃদয় সমবেদনায় পূর্ণ হয়ে গেল। আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, যদি আপনার পুরনো ব্যথার জায়গায় আঘাত দিয়ে থাকি ক্ষমা করবেন। যা বলেছি সম্ভবত এগুলো হয়তো ভুল, কাজেই ভুলে যাবেন। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে ভুল করে না!

ঈশ্বরের দিব্যি, যা বললেন সবই নিখাদ সত্য! ভদ্রলোক ফোঁপাতে লাগলেন, আপনার ঘরের অপেক্ষমান লোকজনকে সরিয়ে দিন তারপর আমি যা বলি তা শুনুন এবং আমাকে সাহায্য করুন। আমার বিশ্বাস আপনি তা পারেন।

তার কথা মতো আমি তাই করলাম তারপর দু'জনে যখন নিরিবিলি

হলাম তখন তিনি সুরু করলেন, আমার পরিবেশ সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন, তা নির্ভুল। সান ফ্রানসিসকোতে আমার জন্ম। আমার পনেরো বছর বয়সের সময়ও আমি কিছু লিখতে বা পড়তে পারতাম না। আমার মায়ের পেষা ছিল চুরি— বাবা কে কোন দিন তা জানতেও পারি নি।

লেখাপড়া শেখবার ইচ্ছেতে মাঝে-মাঝে ছিটকে গিয়ে রবিবার রাতে এক মিশনের ক্লাস করতাম তারপর যখনই সুযোগ পেয়েছি কোন-না-কোন নাইট-স্কুলে ঢুকে পড়েছি। শেষকালে, একজন শিক্ষক আমাকে বইয়ের দোকানে লাগিয়ে দিলেন সেখানে আর্দ্ধেক রাত জেগে বই পড়তাম লেখাপড়ায় পাকাপোক্ত উন্নতি করবার জন্যে।

কুড়ি বছর বয়েসের সময় আমি ছোট্ট একটা দোকান করলাম কিন্তু মুশকিল হল, পুঁজির অভাবে সুবিধে করে উঠতে পারছিলাম না। ঠিক এই সময় একজন মহিলার সঙ্গে দেখা হল সে এমন ভান করল যে তার অনেক টাকাকড়ি আছে। আমি তাকে বিয়ে করলাম। শিগ্রি বুঝলাম, দরদাম করেও খারাপ জিনিষ কিনে ফেলেছি। সে আমাকে বিয়ে করেছিল আমার উচ্চাশার জন্যে—ভেবেছিল, আমি হয়তো জীবনে উন্নতির পথ করে নিতে পারব। যদি একজন সৎ মহিলার সঙ্গে দেখা হত তাহলে হয়তো শেষটা ভালো হত। কিন্তু আমি একটি অপদার্থ মহিলার সঙ্গে গাঁট-ছড়া বেঁধেছিলাম। সে খুব তাড়াতাড়ি মদ খাওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল আর আমাদের জীবন সারাক্ষণ ঝগড়া-ঝামেলায় ভরে উঠল।

একদিন রাত্রে,গভীর নৈরাশ্যে আশাভঙ্গের যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির মধ্যে, একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেল, উন্মত্ত আবেগে আমি তাকে হত্যা করলাম।

এই হচ্ছে সেই বিয়োগান্ত পরিণতি যার ভেতর দিয়ে আমার বিয়ে শেষ হল। যা আপনি আমার হাতের রেখায় দেখেছেন। পুলিশের কাছে ধরা দেবার ইচ্ছে নিয়ে বাড়ি ছাড়লাম। বড়ো হবার বাসনা তখনো মনের মধ্যে রয়েছে, তাই সিদ্ধান্ত পালটালাম। পুলিশে ধরা

দিলাম না। ঠিক করলাম, অপরাধ করা সত্ত্বেও আমাকে জীবনে উন্নতি করতে হবে। বাড়ি ফিরে লাশ মাটির নিচের ঘরে চাপা দিলাম। যতোক্ষণ না মনে সাহস পেলাম সমস্ত সন্দেহকে আড়াল করে রাখলাম। ইতিমধ্যে আমার ব্যবসা লাটে উঠল আর আমিও শহর ছেড়ে ফেরার হলাম।

চিকাগো পৌঁছে, নাম পালটে নতুন করে ব্যবসা ফাঁদলাম। কয়েক বছরেব মধ্যে আমার কঠিন পরিশ্রমের ফল ফলল। সম্পত্তি কেনাবেচার ব্যবসায় নামলাম।

তিরিশ বছর বয়েসে জমি কিনলাম, মস্ত অফিস নিলাম। তারপর থেকে আমি আব কখনো পিছন ফিবে তাকাইনি। বছর চল্লিশ যখন বয়েস হল তখন আমি বেশ ধনী—সকলে আমাকে সম্মান করে; শহরের সকলে আমাকে সবচেয়ে কৃতীপুরুষ বলে জানে।

আমি গব কবে বলছিনে, এটুকু অন্তত বলতে পারি, চিকাগো শহরে আমার চেয়ে বেশি দান-খয়রাত কেউ কবেনি অথবা আমার চেয়ে ভালো কেউ কবতে চেষ্টা করেনি।

কয়েক সপ্তাহ হল আমি পঁয়তাল্লিশ বছরে পৌঁছেছি। একদিন সকালে আমি আমার অফিসের জানালায় বসেছিলাম; এমন সময় দেখলাম একটা লোক দূরবীন দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ আমি লোকটাকে চিনতে পেরে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। লোকটা আমার শ্যালক। যে মহিলাকে আমি হত্যা করেছিলাম তারই ভাই!

লোকটার হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমি নিউইয়র্কে এসেছি; তারপর আপনার কাছে হাজির হয়েছি। আপনি বলেছেন বিবাহিত জীবনের অশুভ ঘটনার প্রভাব আমার ভাগ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে—হয়তো আমাব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবে—এই পয়তাল্লিশ বছর বয়েসে আপনি কি আমার মনের অবস্থা কল্পনা করতে পারছেন!

আমি যথাসাধ্য তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম।

ভদ্রলোক তার সঙ্গে থাকার জন্যে আমাকে একান্তভাবে অনুরোধ করলেন। তার দুঃখে বিচলিত হয়ে সারাটা সন্ধে তার সঙ্গে কাটালাম। দু'জনে একসঙ্গে তার ওয়ালডর্ফের স্যুটে গিয়ে রাতের খাওয়া শেষ করলাম।

শেষে আমিই তাকে ইউরোপে পাড়ি দেবার পরামর্শ দিলাম। আমি ভেবেছিলাম, চেঞ্জ ও সমুদ্রযাত্রা তার পক্ষে ভালো হবে। তিনি ধনী, যেখানেই থাকুন না কেন তার পক্ষে হয়তো তেমন ঝামেলার কিছু নয়।

পরদিন আমি তাকে সেণ্ট লুই জাহাজে সাউদাম্পটনের উদ্দেশ্যে বিদায় জানালাম।

কয়েকমাস কেটে গেল।

ঘটনাটা আমি ভুলেই গেছিলাম সেই সময় একদিন তিনি আমার ফিফথ্ এভিনিউর ঘরে এসে হাজির হলেন।

দেখলাম, ভালোই আছেন; মানসিক অবস্থাও ভালো। তিনি তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বললেন। বিশেষ করে ইউরোপ তার কেমন লেগেছে। তা ছাড়া লণ্ডনের কাছাকাছি একটা সম্পত্তি কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, সেখানেই জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু ফিরে এলেন কেন?

তিনি বললেন, চিকাগো এইজন্যে ফিরলাম আমার এখানে যে-সব জায়গা-জমি আছে তার কিছুটা বিক্রি করে দেব। আপনি ধারণাই করতে পারবেন না, আহাম্মুকরা, কিভাবে ধোঁকা দিয়ে সম্পত্তি বাড়াচ্ছে! এই ব্যাপারটাকে ব্যবসায়ীরা ঘেন্নার চোখে দেখে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি আবার ফিরে যাব এবং শেষ কটা দিন ইউরোপে কাটাব।

আগেকার ঘটনা সম্পর্কে আমরা কেউ কোন কথা বলি নি; কিন্তু যখন সেই রাত্রে ট্রেন চলতে আরম্ভ করল তিনি হাত নাড়তে লাগলেন

তখন আমি অনুভব করলাম, আমার মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি এল!

গুলিতে মৃত্যু!

তিনদিন বাদে নিউইয়র্কের কাগজে আমি পড়লাম:

চিকাগোর সুপরিচিত অধিবাসী মিস্টার—গত মঙ্গলবার ইউরোপ ভ্রমণ সেরে দেশে ফিরেছেন। ট্রেন থেকে নেমে যখন তিনি তার সদ্য নির্মিত সুরম্য প্রাসাদের দিকে যাচ্ছিলেন তখন তাকে পিছন দিক থেকে গুলি করা হলে সঙ্কটজনক অবস্থায়—হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা শুনে দুঃখিত হলাম তার আরোগ্যের কোন সম্ভাবনা নেই-ই। পুলিশের অনুমান, মিস্টার—নিকটবর্তী স্যুটিং গ্যালারী থেকে ছিটকে আসা গুলিতে আহত হয়েছেন ইত্যাদি।

কয়েকদিন পরে পেন্সিল দিয়ে লেখা এই চিরকুটখানা পেলাম:

সুহৃদ্বরেষু কিরো,

আপনি নিশ্চিতভাবে কাগজ পড়েছেন। পুলিশের ধারনা ভুল। ব্যাপারটা আপনাকে জানাতে চেয়েছিলাম। রক্তপাত কিছুতে বন্ধ করতে পারছে না কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে। সত্য প্রকাশ করবেন না। দেখলেন তো, ভাগ্য শেষ পর্যন্ত তার তুরুপের তাস ফেলল!

আমার পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারবেন, কেন আমি হসপিটালের নাম ও অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ গোপন করে গেলাম; কিন্তু এই গল্পের অন্যান্য বিষয় যেমনটা ঘটেছিল তেমনই বলা হল।

আমার প্যারিসে থাকবার সময় একজন মহিলা. (এঁকে ম্যাডাম এক্স বলে উল্লেখ করব)। একদিন বিকেলের দিকে আমাকে দেখা করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন।

হাত দেখার সুরুতেই বললেন, এমনি ইচ্ছে হল তাই আপনাকে ডেকেছি। হাতের রেখা দেখে সব বলে দেওয়া যায় এ কিন্তু আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না।

সুরুতেই এই অভিযোগ আসাতে, আমি গভীর মনযোগ দিয়ে তার হাতের রেখায় অতীত জীবনের ঘটনার সুস্পষ্ট যে ইতিবৃত্ত বিকীর্ণ ছিল তাই বলে যেতে লাগলাম।

আমি বলে রাখি মহিলার বোধহয় এই ভাগ্যবিচার ভালো লাগছিল না; সুতরাং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং উত্তর দেবার ভান করে আমাকে বিভ্রান্ত করতে লাগলেন।

একদিন দুপুরের পর চার্চ থেকে সোজা আমার কাছে এসে বসলেন, অত্যন্ত জাঁকালো ভাবে মলাটের ওপর আলাদা ভাবে সোনার ক্রশ বসানো আইভরি প্রেয়ার বুকখানা পাশে রাখলেন।

আমি সাধারণত সহজাত প্রবৃত্তি বশতঃ আমার কোন মক্কেল সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব রাখি না তা তারা যে ধরনেব লোক হোক না বা যা-ই করে থাকুন না কেন; অন্য সব সময় তাদের সম্পর্কে গভীর সহানুভূতি পোষণ করি আর তাদের সব রকমে সাহায্য করবার আন্তরিক ইচ্ছে বজায় রাখি। কিন্তু এই মহিলা সম্পর্কে আমার মনের ভাবনা একেবারে উল্টো। আমার মনে হল, মন তার বিরুদ্ধে তেড়ে ফুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠবে আর আমার বিরূপ মনোভাব তার কাছে ধরা পড়ার জন্যে আমার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। আমি অনুমান করেছিলাম এই মহিলা বিশ্বাসঘাতিনী ভয়ঙ্কর এক-শত্রু হয়ে উঠতে পারে।

আমি অবশ্যই তার নাম জানতাম না তবে তার উচ্চারণের ধরনে বোঝা যায় তিনি আমেরিকান। তার পোশাক সুচারু দেখেও মনে হয় বিত্তশালিনী। অসামান্য রূপসী—আর সেই ধরনের রূপ যা সব সময় পুরুষকে টানে—! অনেকটা যেন উজ্জ্বল আলোকিত ঠাণ্ডা একটা মোমবাতি যে নিশাচর প্রজাপতিকে আকর্ষণ করে তার পাখনা দুটো পুড়িয়ে আলোর দ্যুতি বাড়িয়ে নেয়।

ভদ্রমহিলা তার অতীত জীবনের কোন একটা ঘটনা আমাকে বলতে অস্বীকার করলেন।

আমি তার হাতটা তুলে বললাম, আপনি বাইশ বছর বয়সে প্রথম বিয়ে করেন ?

তিনি নিজের কাঁধ দুটো একটু ঝাঁকিয়ে ব্যক্তোক্তি করলেন, স্বীকার করতেই হবে আপনার অনুমান যথার্থ।

আমার মনে হল, আমরা দুই শত্রু যেন তীক্ষ্ণাগ্র কিছু নিয়ে পরস্পরের দিকে এগোচ্ছি। তারপর আমি তাকে যখন বললাম, তিরিশ বছর বয়েসের সময় থেকে তার অবৈধ যৌন সংযোগ ঘটেছে এবং সেটা এখনো চলছে। মহিলা স্বীকার করলেন না আমি আবার একটা 'পয়েন্ট' পেলাম ; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত বাদে তার মেয়েলি কৌতূহল তার সংযমকে ছাড়িয়ে গেল আর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বলতে পারেন ব্যাপারটা আর কদ্দিন চলবে—ধরুন না, ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কি মনে হচ্ছে ?

আমি উত্তর দিলাম, আর মাত্তর তিন মাস আর তারপর দারুণ একটা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি ঘটবে। এর থেকে আর কোন দিন সামলে নিতে পারবেন না।

আমার জীবনে কখনো কলঙ্ককর কিছু ঘটতে পারে না। মহিলা সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন, আপনি খুব ভুল করছেন। আমার সঙ্গে কখনো কারো অবৈধ সংযোগ ঘটেনি। আপনাকে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম শুধু দেখতে যে বেহায়া জালিয়াত হিসেবে আপনি কদ্দুর এগোতে পারেন !

হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল, আমার অতিন্দ্রিয় বোধি রোপকয় মহিলা-টির ভেতরের সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পেল। আমার স্বীকার করতে বাধা নেই এই রকম দিব্যপ্রজ্ঞার উদ্ভাস আমাকে প্রায়ই ভবিষ্যত বলতে সাহায্য করেছে।

এটা একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আমি দেখলাম আমাকে আর ভেবে-চিন্তে কিছু বলতে হচ্ছে না শব্দগুলো খরস্রোতে বেরিয়ে আসছে।

ম্যাডাম। আমি বললাম, আপনার আসন্ন জন্মদিনের রাত্রে আপনার প্রতারণা ও ভণ্ডামির জীবন শেষ হয়ে যাবে—ব্যাপারটা যে ভাবেই ঘটুক না কেন। সেই কেলেঙ্কারী আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে—বন্ধু ও বান্ধবীদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরবে—সেই দুঃখের দিনে, আজ যাকে নির্লজ্জ প্রতারক বলে সম্বোধন করলেন তার কাছেই সাহায্যের জন্যে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। যদিও এখুনি বলতে পারছি না ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটবে।

আহত বাঘিনীর মতো মহিলাটি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বিড়বিড় করে বললেন, আপনিই সেই একজন যাকে গৃহ-বন্ধু সব ছাড়তে হবে! না, এর জন্যে আমায় আগামী জন্মদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। এই এখনি—এক্ষুনি আমি দেখিয়ে দিতে চাই এটা করা যেতে পারে।

এই কথাগুলো বলে তিনি কুচকাওয়াজ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেই দিন সন্ধেবেলা ছ'টার সময় পুলিশ আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। ম্যাডাম এক্স ইতিমধ্যে আমার নামে অভিযোগ করেছেন: আমি একটা সাংঘাতিক লোক। ভয় দেখিয়ে তাকে মুচড়ে টাকা বের করে নিতে চেষ্টা করেছি।

তার এই হিংস্র আক্রমণে ক্ষতির বদলে পরিণামে আমার পক্ষে ভালোই হয়েছিল। তদন্ত করতে এসেছিলেন যে ডিটেকটিভ তিনি এই কেস সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখালেন। তিনি ভদ্রমহিলার ফেলে-যাওয়া 'আইভরি প্রেয়ার বুক' এর পাতার মধ্যে—ভারি অদ্ভুত ব্যাপার

বলতে হবে, পেন্সিল দিয়ে লেখা একটি লোকের চিঠি পেলেন। তাতে মহিলাকে তার জন্মদিন পালন করতে, ৮ অক্টোবর সন্ধেবেলায় লোকটির বাড়িতে উপস্থিত হতে রাজি হবার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

'সত্যি, অন্য লোকের কথা জানবার পক্ষে উল্লেখযোগ্য কেস। ডিটেকটিভ মন্তব্য করলেন, দেখুন মঁসিয়ে ৮ অক্টোবরের আগে আমরা কিছুই করছি না।

ইতিমধ্যে ম্যাডাম এক্স যেখানে-যেখানে গেছেন আমার বদনাম করবার সমস্ত রকম চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ক্রুদ্ধা মহিলা তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া এবং তার কেলেঙ্কারী নিয়ে আমার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সকলকে বলে বেড়িয়েছেন।

আর সকলেই তাকে সহানুভূতি জানিয়েছেন—এ ছাড়া তারাই বা কি করতে পারতেন।

মহিলাটি ছিলেন সীজার-পত্নীর মতো সমস্ত সন্দেহের উর্ধে। তিনি ছিলেন চার্চ কমিউনিটির সক্রিয় সদস্য। স্বামীটিও ছিলেন তার একান্ত অনুগত; কেচ্ছায় জড়িয়ে পড়েছেন এমন মহিলাদের তিনি তার সামনে আসতে দিতেন না।

সবাই বলাবলি করলেন, কিরো মারাত্মক একটা ভুল করেছেন।

আট অক্টোবরের রাত্রি এসে প্রায় চলেও গেছিল।

মহিলার এভিনিউ দ্য সাজেঁ লিজেঁর জমকালো বাড়ি অন্ধকার এবং মনে হয় বাড়িতে কেউ নেই। তার অনুগত স্বামী ক্লাবে গেছেন এবং সম্ভবত সকালের আগে ফিরবেন না। সেই আশ্চর্য সরণির গাছের ছায়ার নিচে একটা ট্যাক্সিকে বাড়ির দিকে যেতে দেখা যাচ্ছিল।

সাজেঁ লিজেঁর পথের উপর বাড়িটার কাছাকাছি একটা গাছের ছায়ায় লম্বা আসনের একটাতে ডিটেকটিভ বসে আমার সঙ্গে গল্প করছিলেন।

তিনি আমাকে তার সঙ্গে থাকতে বলেছিলেন আর আমার থেকে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কিছু একটা ঘটবে।

দেখুন মশাই। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, আপনার সেই অলৌকিক দর্শনের মধ্যে কিছু একটা ছিল যার সঙ্গে আমার দেখা মহিলার প্রার্থনা পুস্তকের সেই চিরকুটের কিছু সম্পর্ক আছে ; তা ছাড়া আট অক্টোবর তার জন্মদিন। এ রকম ব্যাপার সাধারণত ঘটে না। তবে যা আমাকে বিমূঢ় করেছে, সেটা হল আজ সন্ধেবেলা আমি তার বাড়ি গেছিলাম ; শুনলাম, ম্যাডাম শহরের বাইরে গেছেন কালকের আগে আর ফিরছেন না।

ডিটেকটিভ ভদ্রলোক তার কথা শেষ করতে পারেন নি আমরা দেখলাম বাগানের রেলিং-এর পাশের একটা দরজা পুরোপুরি খুলে গেল। তারপর কালো পোষাকে ঢাকা একজন দীর্ঘল দেহী মহিলা সন্তর্পনে মাথা বের করে রাস্তার এদিক-ওদিক ভালো করে দেখলেন। মনে হল, কাউকে না-দেখে সন্তুষ্ট হয়ে ছোট দরজা খোলা রেখে ভেতরে ঢুকে গেলেন ; আবার হাজির হলেন কিন্তু এবার একলা নয়। তিনি কোন রকমে কাউকে টেনে-বয়ে আনছিলেন।

সহজাত প্রেরণা বশত, সাহায্য করবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম ; ডিটেকটিভ আমাকে তার থেকে তাড়াতাড়ি টেনে, আমরা যে আসনে বসেছিলাম তার পেছনে একটা গাছের আড়ালে দাঁড় করালেন। যখন দেখলাম, কালো-পোষাক পরা মহিলা, কোন রকমে টেনে সান্ধ্য পোষাক পরা বয়স্ক লোককে, আমরা যে আসনটা ছেড়ে এসেছিলাম সেই আসনে রাখলেন—আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে রেখেছিলাম।

আমরা দেখলাম, রেলিংটাকে খুঁটি করে লাশটাকে হেলান দিয়ে বসালেন এবং হাত দুটো আসনের পিছনে ভয় পাবার ভঙ্গীতে রাখলেন যাতে লাশটা খাড়া থাকে।

তারপর বেড়ালের মতো দ্রুত গতিতে তিনি প্রায় দরজার গোড়ায় পৌঁছে গেছিলেন তখনই ডিটেকটিভ তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে কঠোর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, ম্যাডাম এই নাটকীয় উপাখ্যানের অর্থ কী ?

মহিলা কোন উত্তর দিলেন না। তার স্নায়ু বিকল হয়ে গেছিল দন আটকে সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছিলেন। ডিটেকটিভ তাকে ধ: না ফেললে পড়েই যেতেন। ডিটেকটিভ আমাকে সাহায্যের জ ডাকলেন।

আমরা দুজন তাকে ধরে গেট আর ছোট্ট বাগানটা পেরিয়ে বাড়ি খোলা দরজা দিয়ে ছোট্ট একটা ঘরে নিয়ে গেলাম।

মহিলার কাছে আমাকে একলা রেখে, বাড়ির বাইরের আস বসে থাকা ভদ্রলোকের কাছে গেলেন যদি কিছু করা যায়। তিনি যেতে-না-যেতে মহিলার মূর্চ্ছা ভাঙল তারপর চোখ দুটো আমার ওপর রেখে এমন ভাবে তাকালেন যা আমার পক্ষে ভোলা কঠিন।

এটা হয়তো আমার জীবনের একটা অদ্ভুত মুহূর্ত—হয়তো সবচেয়ে আবেগ নিবিড় সময়।

পর মুহূর্তে মহিলা আমার হাত দুটো চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে সনির্বন্ধ আবেদন জানাতে লাগলেন তাকে বাঁচাবার জন্যে।

এটা কোন খুনের ব্যাপার নয়। কান্না-ভাঙা গলায় তিনি বললেন, আমি তাকে হত্যা করিনি। আমার হাতের ওপরেই তিনি মারা গেছেন। আমি সাহায্য চাইবার ঝুঁকি নিতে পারিনি। আমি তাকে রাস্তার বসবার জায়গায় নিয়ে গেছিলাম এইজন্যে যে তাকে দেখতে পেলে তার লাশ তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। ঈশ্বরের শপথ কিরো, আপনি আগে যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এখন আমাকে সাহায্য করুন।

বুঝাতে পারলাম না তাকে কি করে সাহায্য করব ' যে কোন ভাবেই হোক, খুব দেরি হয়ে গেছিল।

এই সময় দরজায় দাঁড়িয়ে মহিলাটির সব কথা শুনছিলেন সবে ক্লাব থেকে ফেরা তার স্বামী।

প্রায় সেই সময় ডিটেকটিভ, ভদ্রলোককে ঠেলে সামনে এসে বললেন, লোকটা মারা গেছে। আমার বিশ্বাস এই মহিলাই তাকে খুন করেছেন।

তারপর যা ঘটল তা যেন কোন ঘটনার নাট্যরূপ—স্টেজে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

ডিটেকটিভের ওপর নিশ্চল চোখ রেখে আমেরিকান ভদ্রলোক ছাপ ফেলার মতো শান্ত গলায় বললেন, মশাই, আপনার সিদ্ধান্ত ভুল। কাউন্ট সেন্ট এম—আমার সঙ্গে আমার লাইব্রেরীতে ছিলেন, মাত্র দশ মিনিট আগেও তিনি বেঁচে ছিলেন এবং সুস্থ ছিলেন। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি রাস্তা পার হয়ে কেমিষ্টের দোকানে হার্টের ওষুধ আনতে গেছিলাম।

আমি রাস্তা পার হয়ে দেখলাম, আমার স্ত্রী তাকে ধরে বাইরে নিয়ে আসছেন। হয়তো আশা করেছিলেন, খোলা বাতাসে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। উনি নিশ্চয়ই কোন মৃতলোককে বয়ে আনতেন না—আর সম্ভবত তার সে ক্ষমতাও নেই। না, মশাই কাউন্ট সেন্ট এম—যদি তিনি মারা গিয়ে থাকেন তাহলে আমার বাড়ির বাইরে বসবার আসনেই মারা গেছেন।

ডিটেকটিভকে বিভ্রান্ত দেখাল। আমেরিকান ভদ্রলোকের স্বতোৎসারিত শান্ত কথাগুলো তাকে বিচলিত করে তুলেছিল। তার মনে হচ্ছিল, যাই হোক, সবাই যদি খুশি হয় তাহলে খুঁচিয়ে ঘা করে লাভ কি। দেশের লোক তার মাইনে জোগায় অপরাধ থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্যে, অপরাধী তৈরি করবার জন্যে নয়।

ঘরের মধ্যে নীরবতা নেমে এল, কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর আমেরিকান ভদ্রলোক বললেন, আমার এখন ইচ্ছে; আপনাদের দু'জনের সাহায্যে কাউন্ট সেন্ট এম—কে তার নিজের এ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যেতে চাই যাতে তার নিজের ডাক্তার তাকে দেখতে পারেন। আসুন ভাবনা চিন্তা করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

যখন সার্জেঁ লিজেঁর গাছপালার ওপর ভোরের আলো ফুটছে, তখন তিনটে লোককে দেখা গেল এভিনিউ মার্সিপউর দিকে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। কাউন্ট সেন্ট এম-এর লাশটাকে আমেরিকান ভদ্রলোক

পোক্ত করে ধরে রেখেছিলেন, এতটুকু নড়ছিল না বা ঢুলছিল না। পথ-চলতি মানুষদের কেউ মুহূর্তের জন্যেও বুঝতে পারেনি তিনজনের একজন একটি মৃতদেহ।

পরদিন সকালের কাগজে কাউন্ট সেন্ট এম-এর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া-বন্ধের জন্য মৃত্যুব ব্যাপারে কয়েক অনুচ্ছেদ লেখা হয়েছিল। তারপর অন্য অনেকের মতো তিনিও বিস্মৃত হয়ে গেলেন।

আর ম্যাডাম এক্স এর স্বামী, যিনি তাকে আশ্চর্য ভাবে গ্রেপ্তারের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন, বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে মহিলার সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করেছিলেন।

খুব কম লোকই জানে, ম্যাডাম এক্স নির্বান্ধব ও সহায় সম্বলহীন অবস্থায় প্যারিস ছেড়ে যেতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

ম্যাডাম এক্স এখনো বেঁচে আছেন।

সেকেলে বাড়ির গল্প

আমার সঙ্গে কোন প্রেতচর্চাসঙ্ঘের সম্পর্ক নেই। কেবল ঘটনাটাই বলছি। ভয় পাচ্ছি লোকের ধারনা হতে পারে স্বার্থসংশ্লিষ্ট তরফ থেকে গল্পটা ফাঁদা হয়েছে।

কয়েক বছর আগে খাম-খেয়ালের বশে লণ্ডন শহরের বনেদী এলাকায় গিয়ে থাকবার ইচ্ছে হল; নদীর পাশ দিয়ে যে প্রধান সড়কটা চলে গেছে তার থেকে একটু ভেতরে টেম্পলের কিংস বেঞ্চ ওয়াকের একটা অদ্ভুত ও মনোরম সাবেকি বাড়িতে কিছুদিন ছিলাম।

আমার ইচ্ছে মতো বাড়ি পাওয়াতে সন্তুষ্ট হওয়াই উচিত ছিল, কেননা বাড়িটা ছিল সব রকমে সেকেলে। সমস্ত বাড়িটা—প্রায় তার কাঁচ বসানো জানালা থেকে গৃহস্বামিনীর বেড়াল—সবই পরিপাটি; বেড়ালটা ইঁদুর ধরার কাজের চেয়ে খিলানের তদারকি বেশি করত

আমার বাড়িওলি স্কটিশ ধরনের গিন্নি-বান্নি মানুষ; সৎ, কর্মঠ এবং পরিশ্রমী। তার নীতিগুলো অনিন্দ্যনীয়; তার যৌবনের দিনকাল ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহনের সময় পেরিয়ে কোন অজ্ঞাত কালে ঠেকে আছে।

আমার ব্রেকফাস্ট ঘড়ি ধরে ন'টার সময় নিত্য হাজির হত। আর ব্যাপারটা হত এই, আমি দশটা পর্যন্ত ঘুমোতাম আর প্রায়ই ঠিক নিয়ম মতো খাবারটা টেবিল থেকে তার সরে যাবার নির্দিষ্ট সময় সরে যেত। ক্ষুধার্ত থাকলেও আপত্তি করার সাহস পেতাম না। কাছাকাছি কোন হোটেলে খাওয়া শেষ করতাম।

শেষে ভাবলাম, আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। ব্রেকফাস্টের বাড়তি পয়সাটা আমার বাঁচানো দরকার; কেননা সপ্তাহের পর সপ্তাহ

পুরনো ধরনের হাতের লেখায় আমার না-খাওয়া মিলের বিল এসে হাজির হত টেবিলে।

আমি মহিলাকে আমার বিনিদ্র রাতের কথা জানালাম আর অনুতপ্ত হবার ভঙ্গীতে বললাম, যদি দশটার থেকে খাবার সরিয়ে নেবার সময়টা মিনিট দশেক পিছিয়ে নেন।

মহিলা তীব্র কণ্ঠে বললেন, যুবক, তোমার বিবেকই কেবল তোমাকে জাগাতে পারে। রবিবার গীর্জায় যাও। রাত্রে প্রার্থনা কর, আর সকাল-সকাল শুয়ে পড়, তার পরেও ন'টার সময় তোমার ব্রেকফাস্ট খেতে না পার তা'হলে তুমি অবশ্যই এমন একটা দুর্বৃত্ত যার আমার বাড়িতে থাকা উচিত নয়।

হায় রে কপাল, বৃদ্ধা মহিলার যোগ্য উত্তর দয়ার্দ্র প্রকৃতি দেবী আমার মনে রাখতে দিলেন না।

সম্ভবত সেই ঘরে কিছু একটা ছিল যা আমার ঘুমের দফারফা করত। বোধহয় কোন ভৌতিক ব্যাপার রাতের পর রাত আমায় জাগিয়ে রেখে শান্তি কেড়ে নিত।

একদিন দুপুরে ক্লান্ত হয়ে আমার বৈঠকখানার ছোট্ট শোফায় ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। জেগে উঠে দেখি অনেক রাত হয়ে গেছে আর আমার হাতে একটা পেন্সিল ও মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন যা তখনো স্পষ্ট মনে আছে। স্বপ্নের কথাটা যেমন মনে করতে পারছিলাম হাতের পেন্সিলের ব্যাপারটা কিছুতেই মনে আনতে পারছিলাম না।

আমার পাশে কয়েকটা কাগজ পেলাম। বিমূঢ় হয়ে দেখলাম, আমার স্বপ্নের মোদ্দা ব্যাপারটা তাতে ঘুমের মধ্যে লিখে ফেলেছি।

বিষয়টা হল, যে ঘরটায় আমি থাকতাম সেটা দ্বিতীয় জেমসের রাজত্বকালে স্টেলা নামে একটি সুন্দরী মেয়ে আর তরুণ এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দেখা-শোনার জায়গা ছিল।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন প্রোটেস্টান্ট আর স্টেলা ক্যাথলিক। একদিন রাত্রে যখন ক্যাথলিক রাজার কাছে তাদের খবর জানিয়ে

দেওয়া হয়েছে বলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি খবর পেলেন, তখন উন্মত্ত হয়ে তার উপপত্নীকে হত্যা করে এই বাড়ির নিচে একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেন।

এই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখার পর আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম আর আশ্চর্য হয়ে বলতে হয়, শান্তিতে ভালো করেই ঘুমোলাম।

পরের দিন রাত্রে আবার সেই একই স্বপ্ন দেখলাম। এই সময় স্বপ্নে অশরীরীকে অনুসরণ করে একটা ঘরে গেলাম।

এ-ঘরে আমি কখনো ছিলাম না; কিন্তু স্বপ্নে আমি স্পষ্ট দেখলাম, মাটির নিচের অব্যবহৃত ঘর—তার মেজে বৃহদাকার পাথরের চৌকো টুকরো দিয়ে তৈরি। কালে-কালে তা কালো হয়ে গেছে।

স্বপ্নে দেখলাম, সেই ঘরে আমি হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানো হল। যেই প্রার্থনার শেষ কথাটা উচ্চারিত হল অমনি সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল আর জায়গাটা আবার ফাঁকা আর পোড়ো হয়ে গেল।

তিন-তিনবার আমি স্বপ্ন দেখে ঠিক করলাম, দেখি খুঁজে-টুজে যদি কিছু পাওয়া যায়। কাজেই পরদিন সকালে বাড়ির কর্ত্রীকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম সত্যি এরকম কোন ঘর আছে কিনা—তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জানালেন, যারা আমার ঘরে শুয়েছে এই একই প্রশ্ন করে আমায় জ্বালিয়ে মেরেছে। হ্যাঁ, রান্নাঘরের নিচে একটা গোপন ঘর আছে।

তবে আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, ভদ্রমহিলা তা বলতে পারলেন না। আমি ভেবে দেখলাম, এ ব্যাপারে আর জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন লাভ নেই। দুপুরের পর ভদ্রমহিলাকে বেরিয়ে যেতে দেখে ঠিক করলাম একলাই অনুসন্ধান চালাব।

আমি রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলাম। ঘরটা রাস্তার সমতলের ঠিক নিচে; বেশ খানিক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পুরনো ওক্ কাঠের একটা দরজা খুঁজে পেলাম তার ভেতর দিয়ে রহস্যময় ঘরের দিকে পথ গেছে।

ঘরটা অবিকল আমার স্বপ্নে দেখা ঘরের মতো; এমন কি মেজেটাও গাঢ় কালো রঙের পাথর দিয়ে বাঁধানো।

আমি ঘরে ফিরে এলাম। যা দেখেছি তার ভাবনা মন থেকে দূর করার জন্যে সাজ-সজ্জা করে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবলাম।

সারাটা সন্ধে গোটা দুই থিয়েটারে চক্কর মেরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে গেল।

যখন ঘুম ভাঙল তখন সবে ভোর হয়ে আসছে। ভাবলাম, বড্ড সকাল-সকাল ঘুম ভেঙেছে তাই আবার তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম।

আবার সেই অদ্ভুত স্বপ্ন এল পরিপূর্ণ সজীবতা নিয়ে ; আবার সেই একই দৃশ্য আমার চোখের সামনে ঘটতে লাগল। তবে তার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই—স্টেলার মূর্তি আমাকে পথ দেখিয়ে সেই মাটির নিচের ঘরে নিয়ে গেল তারপর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, আজ রাত বারোটার সময় এই ঘরে মৃতের জন্যে প্রার্থনার আয়োজন করো। তারপর সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চমকে উঠে ঘুম ভেঙে গেল তখনো কথাটা আমার মনে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে। মেয়েটার তখনো লেগে থাকা নিশ্বাস মুছে ফেলার জন্যে কান দুটো ভালো করে রগড়ালাম।

তখনো একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল যার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি পাশ ফিরে দেখলাম, দেওয়ালপত্রে আমার চোখের সামনে লেখাগুলো বিস্ফারিত হয়ে আছে : মাঝরাত্রে এই ঘরে অনুষ্ঠিত মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা করো।

আজ পর্যন্ত জানি না কি ভাবে দেয়ালে কথাগুলো লেখা হয়েছিল। হয়তো আমি ঘুমের মধ্যে টেবিল থেকে পেন্সিল নিয়ে লিখে থাকতে পারি কিন্তু এর যা ফল দাঁড়িয়েছিল তা স্বপ্নের চেয়েও আঁৎকে ওঠার মতো!

আমি উঠে পোষাক পরে বেরিয়ে পড়লাম। যে করেই হোক নিঃশব্দ নির্দেশ পালন করতেই হবে।

দরজা খুলে পথে নামলাম। সকাল বেলার ঝলমলে আলোর সঙ্গে

রাতের গাঢ় অন্ধকারের সঙ্গে এত তফাৎ যে মুহূর্তের জন্য আমার উদ্দেশ্যের প্রকৃতিস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল। তবে ব্যাপারটা মুহূর্তের জন্যেই ঘটেছিল।

আবার সেই দৃশ্যগুলো আমার মাথার মধ্যে ভিড় করে এল। আমার সেই কথাগুলো কানের কাছে গুনগুন করতে লাগল।

আমি বললাম, সমস্তটাই আমি পালন করতে চেষ্টা করব। আমার ব্যাপারটা আমি কাউকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করব। অবশ্যই চেষ্টা করব।

আমি ক্যাথলিক নই; আমি কখনো কোন গোঁড়া মতের সমর্থক ছিলাম না কিন্তু প্রায়ই পাশের রাস্তার ক্যাথলিক চার্চে যেতাম। এই আসা-যাওয়ায় গীর্জার কয়েকজন যাজকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমি ভাবলাম, সেখানে গেলে হয়তো তাদের সাহায্য পাব।

চার্চে পৌঁছে আমার সুপরিচিত যাজকের সঙ্গে দেখা হল। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, উদার এবং সহানুভূতিপ্রবণ। হায়রে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে, দেখা গেল তার একেবারেই সহানুভূতি নেই। আমি তাকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না যে ব্যাপারটা আদৌ কোন ধোঁকা-বাজি নয়।

ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হয়ে আমি ফিরে এলাম।

গীর্জার পর গীর্জা আমি পার হয়ে এলেও কোনটার ভিতরে ঢুকতে সাহস করি নি। আমার পাদরি বন্ধুর শেষ কথাটা ছিল ঃ আপনার এ চেষ্টা ছেড়ে দিন। লণ্ডন শহরে এমন একজন পাদরিও পাবেন না, আপনি যা চান তা করতে রাজি হবে।

তখনো খুব বেলা হয় নি। আমি গ্রীন পার্কে গিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম ও তারপর একটা নির্জন জায়গা খুঁজে নিয়ে বসে ভাবতে লাগলাম, কি করে কাজটা করা যায়। হঠাৎ চোখ তুলে দেখি, একজন তরুণ পাদ্রী নিবিষ্ট মনে একটা প্রার্থনা পুস্তক পড়তে-পড়তে আমার দিকে আসছেন। আমাকে 'সুপ্রভাত' জানিয়ে বইটা বন্ধ করলেন আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমরা আলাপ শুরু করলাম।

ভাবলাম এই আমার সুযোগ। স্বপ্ন সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে বুঝলাম, তার বিশ্বাস হয়েছে ; তারপর আর দেরি না করে পুরো ব্যাপারটা তাকে বললাম আর আমি কি সঙ্কটে পড়েছি সে কথাও তাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম।

শুনে আনন্দিত হলাম তিনি বললেন, এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে আমি আপনাকে সাহায্য করব। আপনি শান্ত হন। আপনার যা দরকার আমিই সব করব। আজ রাতে আমি আপনার বাড়ি যাব।

রাত্রে কয়েকজন বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি তাদের সমস্ত ঘটনাটা বললাম। তারা একান্তভাবে অনুরোধ করলেন, যদি পাদ্রীর আপত্তি না থাকে তবে প্রার্থনা অনুষ্ঠানের সময় তারা হাজির থাকতে চান।

বন্ধুদের মনোরম সান্নিধ্যে থেকে সময়টা যেন উড়ে গেল। কে যেন বলল, বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি।

ঠিক সেই সময় দরজার কাছে পাদ্রীর পায়ের শব্দ পেলাম।

পাদ্রী বন্ধুদের উপস্থিতিতে কোন আপত্তি জানালেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মধ্যরাত্রির অনুষ্ঠানের জন্যে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম।

অনুষ্ঠানের সময় অস্বাভাবিক কিছু ঘটল না। জায়গাটা মৃত্যুর মতো নিথর ছিল। বাতির অস্থির আলোয় তরুণ পাদ্রীর নিবিষ্ট পাণ্ডুর মুখ আমার মনে যে অনুভবের সৃষ্টি করেছিল তা ভোলবার নয়।

অনুষ্ঠান শেষ করে আমরা নিঃশব্দে আমার ঘরে ফিরে এলাম আর স্বল্পক্ষণের মধ্যে পাদ্রী আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেলেন।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে।

অদ্ভুত ঘটনার কথা প্রায় ভুলেই গেছিলাম।

সেদিনের মধ্যরাত্রির অনুষ্ঠানের পর আমার ঘুমের আর কোন গোলমাল হয়নি।

একদিন সকালে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার সময় দেখলাম একদল রাজমিস্ত্রি আর জলের কলের মিস্ত্রি ঘরের সঙ্গে রাস্তার যোগাযোগ করবার জন্যে দরকারি কি-সব কাজকর্ম করছিল।

ঘরের মেঝের পাথর তোলবার দরকার পড়েছিল তাদের আর তারা বাড়ির নিচে একটা কুয়োর মুখ আবিষ্কার করে আশ্চর্য হয়ে গেছিল।

তারা কি দেখেছিল তার একটা বিবরণ সান্ধ্য পত্রিকায় বেরিয়েছিল ঃ

মাটির নিচে মনুষ্য দেহাবশেষ ! চমকপ্রদ আবিষ্কার !!

আজ, কিংস বেঞ্চ ওয়াকের একটা বাড়িতে সারাইয়ের কাজে নিযুক্ত মিস্ত্রিরা একতলা ঘরের নিচে বড় একটা কুয়ো আবিষ্কার করেছে। কুয়োর তলায় মরচে ধরা তরবারি আর মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে কঙ্কালটা কোন তরুণীর। তরবারিতে রাজা দ্বিতীয় জেমসের রাজত্বকালের তারিখ দেওয়া আছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, কৌতূহলোদ্দীপক এই আবিষ্কারের সঙ্গে হয়তো বিচিত্র কোন রোমান্স জড়িয়ে আছে।

তারপর থেকে কতো দিন পার হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত নিজের কাছে এই প্রশ্নের জবাব পাইনি ঃ রহস্যময় এই ঘটনাটা কি স্বপ্ন না অন্য কিছু !

প্রতিদ্বন্দ্বীর আহ্বান

১৯০০ সালের মহাপ্রদর্শনীর সময় আমেরিকা বেড়িয়ে প্যারিসে গিয়ে হাজির হলাম।

আমি রু ক্লেথ ম্যারটে ওপরে চমৎকার একটা এপার্টমেণ্ট ভাড়া নিলাম। জায়গাটা সাজেঁ লিজেঁর লাগোয়া আর প্রদর্শনীর প্রধান ফটকের খুব কাছে।

প্যারিস তখন স্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে আর নানান জাতের লোক এসে জমেছে সেখানে। পৃথিবীতে যতো রকমের ভাষা আছে কান পাতলেই প্যারিসের কাফে আর পথে-ঘাটে শোনা যায়। আবহাওয়া মনোরম আর মহাপ্রদর্শনীতেও এমন কিছু ছিল যা সহজে ভোলা যায় না।

প্রথম সপ্তাহ আমি পরম আনন্দে ছিলাম। আমার কিছু করবার ছিল না; কেন না, আমার এপার্টমেণ্ট তখনো ঠিকমতো সাজানো-গোছানো হয়নি। কাজেই এই সময়টা আমি সাজেঁ লিজেঁর একটা হোটেলে বসে সময় কাটাতাম, মিউজিয়াম আর ছবির গ্যালারিতে ঘুরতাম। একজন অলস পর্যটক একটি রূপসী নগরীতে যা-যা করতে পারে বলে আশা করা যায় তাই করতাম।

প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে আমার স্বপ্নের দিগন্তে মেঘ জমতে লাগল। ব্যাপারটা কিছুই নয় হঠাৎ একটা ডুয়েল লড়বার চ্যালেঞ্জ পেয়ে বসলাম। এটা আশাও করি নি আর এর জন্যে আমি দায়ীও ছিলাম না।

একজন মহিলাই এর কারণ, আসলে এর জন্যে আমাকে বা তাকে, কাউকেই দোষী করা যায় না।

হোটেলের রেস্তোরাতে আমার পাশের এক টেবিলে সুন্দরী এক

মহিলাকে দেখলাম। তার সঙ্গীকে স্পেনীয়দের মতো দেখতে—সম্ভবত তার স্বামী।

বোধহয় একই সময় নিজেদের টেবিলে পৌছেছিলাম। দেখবার কিছু ছিল না বলে আমরা দু'জনের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলাম দুজনে—অনেকটা চিড়িয়াখানার জন্তুরা তাদের রক্ষক খাবার আনবার সময় যে ভাবে তাকায়।

আমি শুনতে পেলাম, লোকটা স্পেনীশ ভাষায় মহিলাকে বলছেন, আমেরিকানদের তিনি কেন অপছন্দ করেন। এবার বুঝতে পারলাম পরিপাটি করে কামানো মুখ দেখে আমাকে ঘৃণিত শত্রু বলে মনে করেছেন আর যে-শত্রুরা স্পেনীশ-আমেরিকান যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল।

হঠাৎ ঝট করে ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, মঁসিয়ে আমার স্ত্রী আপনাকে একটা চিরকুট দিয়েছেন সেটা আমাকে এক্ষুনি দিন।

কাগজে কি আছে সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে অস্বীকার করলাম। যেহেতু আমাদের কারোরই রেস্তোরাতে কোন দৃশ্যের অবতারণা করার ইচ্ছে ছিল না তাই পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে তাল-কুঞ্জে গিয়ে হাজির হলাম।

সেখানেও তিনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি একই কথার প্রতিধ্বনি করলেন।

কয়েক গজ দূরে সুন্দরী মহিলাকে দেখতে পাচ্ছিলাম, তার মিনতি ভরা কালো চোখ দুটো বারবার মিনতি করতে লাগল, কাগজখানা যেন না—দি।

অবশেষে লোকটা সাপের মতো হিসফিস করে তার কার্ডখানা আমার হাতে দিল, অনুগ্রহ করে এই হোটেলে কাল সকাল ন'টায় হাজির থাকবেন তখনই আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে পাবেন।

আমি বাড়ি ফিরে কাঁপা হাতে আলো জ্বেলে পড়লাম চিরকুটে মহিলা কি লিখেছেন।

স্বীকার করতেই হবে হতাশ হলাম। লেখা ছিল: মঁসিয়ে

আমি আপনার বই পড়েছি এবং আপনাকে কিরো বলে চিনতেও পেরেছি। অনুগ্রহ করে কাল সকাল দশটার সময় রিডিং রুমে থাকবেন আর আমার হাতটা একটু দেখবেন। আমি আপনাকে হাত দেখাতে চেয়েছি একথা স্বামীকে জানাতে চাচ্ছি না। এ কথা গোপন রাখবেন।

ভাবলাম, হায়রে কপাল এমন একটা সামান্য বাজে কাগজের টুকরোর জন্যে আমাকে শেষতক ডুয়েল লড়তে হবে নাকি। ভাবলাম, আমি লোকটাকে শান্ত করব আর তাকে বলব তার ঈর্ষার মতো কোন কারণ ঘটে নি।

আমার মনে পড়ল মহিলার চোখ-তুটির কথা আর তিনটে শব্দ : একথা গোপন রাখবেন।

কাজে-কাজেই ঠিক করলাম ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে দেখি কাল সকালে কী ঘটে।

ঠিক ন'টায় ভদ্রলোকের প্রতিনিধি মাকু্ইস ডি স্যান আরো-কি-সব, তার কার্ড পাঠালেন। তিনি আমার বসবার ঘরে ঢুকলেন দেখলাম, খাবার ঘরের সেই প্রতিবেশীর চেয়ে এই স্পেনীয়ার্ডটি আরো ঝাঁঝালো।

আমি তাকে সুপ্রভাত বলবার আগেই তিনি সুরু করলেন, মঁসিয়ে আপনি আমার বন্ধুকে নিদারুণ ভাবে অপমান করেছেন। ইনি স্পেনের সম্ভ্রান্ততম-বংশগুলির একটাতে জন্মগ্রহণ করেছেন—আর আপনি একজন তুর্বিনীত আমেরিকান। তার হয়ে ভালো করে খোঁজ খবর নিতে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার রক্ত মাথায় চড়ে গেল, নিশ্চয়ই সেনর, আপনার দরকার মতো সব খোঁজ-খবর পাবেন।

কাল সকাল ছ'টার সময় একজনকে সঙ্গে নিয়ে বোইস ডি বুলন-এর প্রপাতের কাছে অপেক্ষা করবেন।

নিশ্চয়ই সেনর।

কি ধরনের হাতিয়ার আপনার পছন্দ?

স্মিথ ও ওয়েসনের রিভলবার। আমি উত্তর দিলাম।

ঠিক আছে। আগন্তুক মাথা নাড়লেন, কাল সকাল ছ'টা, বিদায় সেনর।

তারপর ব্যাপারটার কৌতুক-কর দিকটা মনে করে আমি হেসে বললাম, যদি আপনি তাই ইচ্ছে করেন সেনর!

তিনি না-হেসে আসল স্পেনীয় কায়দায় সেলাম ঠুকে গদাই-লস্করি চালে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

আকাশ-পাতাল ঢুঁড়েও ডুয়েলে আমি সহযোগী খুঁজে পেলাম না। প্যারিসে আমি হপ্তা-খানেক আছি কারো সঙ্গে চেনা-শোনাও হয় নি।

অবশেষে আমার পুরনো বন্ধুর ছেলে আলাস্টেয়ার ডি অয়লে, অয়লের মার্কুইয়ের কথা মনে পড়ল। তখনি তার কাছে ছুটে গিয়ে আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা বললাম।

আলাস্টেয়ার ব্যাপার শুনে চাঙ্গা হয়ে উঠল, আঃ আপনার কী সৌভাগ্য! মাত্র এক সপ্তাহ প্যারিসে থেকে ডুয়েলের আহ্বান! পৃথিবীতে আর কি কোন অস্ত্র পেলেন না যে রিভলবার বেছে নিলেন?

চ্যালেঞ্জ পার্টির মতো আমারও নিজের পছন্দ মত অস্ত্র বেছে নেবার অধিকার আছে। আমি উত্তর দিলাম, তা ছাড়া আমি আমেরিকায় থাকতে এই অস্ত্রটার ব্যবহার ভালো করে শিখেছিলাম।

সাবাশ! সে চেঁচিয়ে উঠল, চলুন তা হলে গ্যাসটন রেনেটসের স্যুটিং গ্যালারিতে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা প্র্যাকটিস করা যাক।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে স্মিথ ও ওয়েসনের রিভলবার দিয়ে টারগেটের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। আমি 'আমেরিকান ড্রপ সট' অভ্যাস করতে লাগলাম। রিভলবারটা উঁচুতে তুলে কাঁধ পর্যন্ত টেনে নামিয়ে গুলি করা মাত্তর, আলাস্টেয়ার, চাকর-বাকর ও আমাকে চমকে দিয়ে পিস্তলের গুলি ছ'বারের মধ্যে পাঁচবার মূর্তিটার হৃদপিণ্ড বিদ্ধ করল।

বিরতির সময় আমি আর আলাস্টেয়ার আগামীকালের ডুয়েল নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করছিলাম। কথাবার্তা ইংরিজিতেই হচ্ছিল। লক্ষ্য করলাম চাকর-বাকরদের একজন খুব আগ্রহী হয়ে

আমরা যা বলছিলাম তাই শুনছিল। যাই হোক তখন ব্যাপারটা মনে কোন রেখাপাত করে নি। আমি আর আলাস্টেয়ার একসঙ্গে লাঞ্চ খেলাম আর সারাদিন একসঙ্গে কাটালাম।

রাত্তিরে আমি সব ব্যবস্থা করলাম ; কি জানি খারাপ যদি কিছু ঘটে। আর স্বীকার করতেই হবে, রাত্রে খুব অল্পই ঘুমিয়েছিলাম।

পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আলাস্টেয়ার এল। আমরা নিচে নেমে কফি খেলাম। তারপর গাড়ি চালিয়ে বয়েস ডি বুলনের মনোরম বনভূমির ভিতর দিয়ে আমাদের দেখা-হবার জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম।

আমার মনের অবস্থা সবিস্তারে বলতে চাই না—সকালবেলার সৌন্দর্য অথবা বসন্তকালের ঘাসের শ্যামলিমা অথবা এই সব ধরনের কিছু ছ' শিলিং-এর বইতে যে-কেউ পড়তে পারবেন। যেহেতু আমি কোন রোমান্স লিখছি না, সোজাসুজি ব্যাপারটা বলতে চাই, তাই যে কেউ বুঝতে পারবেন যখন একজনকে ফাঁসি দিতে নিয়ে যাওয়া হয় তার মনের কী অবস্থা হয় !

বেওনেট হাতে আমার কোন সশস্ত্র প্রহরা নেই সত্যি ; কিন্তু এটা আমার সব সময় মনে হয়েছে, প্রহরী আমার আছে। আর সেটা আমার নৈতিক প্রহরী—যেমন বিবেক আর সম্মান, আর সেটাই আমাকে পিছনে ফিরতে দেবে না হয়তো আমি চাইলেও।

হাজির হয়ে দেখা গেল আমরাই প্রথম নয়। একটু এগিয়ে দেখি দীর্ঘকায় কালো পোষাক পরা মার্কুইস ডি স্যান বজ্র ও আগুনের প্রতিমূর্তি হয়ে সাক্ষাতের পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে অধৈর্য হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছেন।

আমরা গাড়ি থেকে নামতেই তিনি গম্ভীর ভাবে নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে আলাস্টায়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন, আশা করি ইনি আপনার সহযোগী ?

হ্যাঁ। আমি উত্তর দিলাম।

তা হলে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছু কথা বলবার অনুমতি দিন।

তারা হেঁটে কিছু দূরে গিয়ে মিনিট পাঁচেক ধরে কথা বললেন।

আমি কেবল দেখতে পাচ্ছিলাম, তাদের হাত ও অস্ত্র প্রচণ্ড ভাবে ওঠা-নামা করছিল। এক সময় আমার প্রায় মনে হয়েছিল আমাকে না-ডেকে তারা বিরোধের ফয়সাল্লা করে ফেলতে যাচ্ছেন।

তারপর তারা আমার দিকে এগিয়ে এলেন। স্পেনীয়ার্ডটিকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছিল যেন তার শাশুড়ি অসময় এসে হাজির হয়েছেন।

আলাস্টেয়ারের মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি, বন্ধু আপনি আপনার স্মিথ ও ওয়েসনের রিভলবার অন্য দিনের জন্যে রাখুন। বন্ধু মার্কুইস ভয় পেয়ে গেছেন তিনি লড়াই করবেন না। তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। ভোর বেলায় ঘুম ভেঙে ওঠার জন্যে প্রাতঃভোজনের ক্ষিদেটা মরে যাবে না বলে আশা করেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপারটা কি হল?

সেটা আমি প্রকাশ করতে পারছি না। আলাস্টেয়ার উত্তর দিলেন, তবে এটুকু বলতে পারি, যে-ভদ্রলোক আপনাকে ডুয়েলে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন, তিনি এই ভদ্রলোককে এই কথা বলতে পাঠিয়েছেন যে সমস্ত ব্যাপারটা তার ভুল বোঝার জন্যেই ঘটেছে। তা-ছাড়া ইচ্ছে মতো ব্যাপারটা জানবার অধিকারও তার নেই। এ রকম করার জন্যে তিনি মার্জনা চেয়েছেন।

এই ঘটনার এক মাস পরে রহস্যের সমাধান করতে পেরেছিলাম আর সেটা করেছিলেন মহিলাটি নিজে। আমি যখন প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত তখন একদিন সেই মহিলা হাত দেখাতে এসেছিলেন।

সত্যি, প্রাচীন প্রবচন এ ভাবে বলা যায়, যেখানে ইচ্ছা সেখানেই মহিলা। কেননা শেষে দেখা যায় মহিলারা যা ইচ্ছে তাই করে থাকেন। এমন কি যদি জনা কুড়ি ঈর্ষাতুর স্বামী বাধা দেন তাহলেও।

তার গল্পটা ছিল অল্প কয়েকটা কথার। ডুয়েলটা যে বন্ধ হয়ে গেল তার কারণ খুবই সরল। গ্যাসটন রেনেটসের একজন পরিচারক তার স্বামীর চাকরের ভাই। কাজেই কাল সকালে যে-বিদেশী ডুয়েল লড়বেন তার বিষয় শুনেছিল—পূর্ণাবয়ব লক্ষ্যবস্তুর উদ্দেশ্যে তার নিক্ষিপ্ত গুলির প্রত্যেক ছ'টার মধ্যে পাঁচটাই বুকে গিয়ে লেগেছিল।

সাপের প্রতিহিংসুক

জিওফ্রে গিবসন, সাতাশ বছর বয়েসে তার রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেনের পদ পেয়ে গেলেন। একটা ব্যাপারে আমার কাছে দুঃখ করেছিলেন, এখনো যুদ্ধ দেখতে পেলাম না!

তিনি সেই অদ্ভুত ধরনের মানুষ যারা হত্যা করে আনন্দ পান।

কলেজ ছাড়বার পর থেকে তিনি তার এই প্রবৃত্তির চর্চা করে গেছেন। এ ব্যাপারে তার কোন ভণ্ডামি ছিল না। আর প্রকাশ্যেই একথা বলে বেড়াতেন যে এই জন্যেই সেনাবিভাগে কাজ নিয়েছেন। যেহেতু বুয়োর যুদ্ধ ফসকে গেছিল—সেইজন্যে একবার শিকারে বেরিয়ে দেদার সিংহ আর হাতি মেরে এনেছিলেন।

একটা প্রাণী সম্পর্কে তার সাংঘাতিক আতঙ্ক ছিল—তা হচ্ছে সাপ। তার হাতের রেখায় এই সাপ থেকে বিপদের আশঙ্কা সুস্পষ্ট লেখা ছিল। অন্য যা কিছু বলতাম তা হয়তো তাকে অসন্তুষ্ট করত তাই তাকে শুধু বলেছিলাম, এক বছরের মধ্যে ভালোবাসার উন্মাদনায় পড়বেন তারপব উন্মত্ত আবেগে বিয়ে করবেন।

জিওফ্রে গিবসন কোন রকমেই মেয়েদের পছন্দ হবার মতো পুরুষ নয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তখনো পর্যন্ত আকর্ষণ করবার মতো মহিলার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় নি বা তাৎক্ষনিক ভাবেও কাউকে ভালোবাসেন নি।

গিবসন মা-বাবার একমাত্র ছেলে। অল্প বয়েসে মা মারা যান। বাবা ছিলেন অবসর প্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী। তিনি আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি। কাজেই জিওফ্রে এমন ভাবে লালিত হয়েছেন যে মেয়েদের সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকাই স্বাভাবিক। মেয়েদের সম্পর্কে তার আগ্রহও ছিল কম।

তার হাতের রেখা বলে দেয়, অন্য সব ব্যাপারে তিনি স্বাভাবিক—যদি তার জীবনে ভালোবাসা আসে—তবে উদগ্র এক হিংসায় সে ভালোবাসার পরিণতি হবে বিয়োগান্ত। হাতের রেখা এত স্পষ্টভাবে সেটা নির্দেশ করছে যে ফলাফল যাই হোক না আমি আর তাকে সর্তক করতে চেষ্টা করলাম না।

আমার মনে হল, এটা ভাগ্যের বিধান।—আর তা সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ এবং অনিবার্য—হয়তো দু'জনের মৃত্যুতে তার বিষণ্ণ সমাপ্তি ঘটবে।

কিছু পুরুষ আর নারী আছেন যারা ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে পারেন—এমন কি ভাগ্যের উরুতে কঠিন আঘাত করে সংগ্রাম থেকে আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন। যেমন বেথেলে জেকব পেরেছিলেন।

আরেক ধরনের মানুষ আছেন' যারা জীবনে ভাগ্যের প্রসন্নতা পায় না। জিওফ্রে গিবসন এই শেষোক্ত পর্যায় পড়েন।

ঠাট্টা-ইয়ার্কি তার বরদাস্ত হয় না। সোজাসুজি প্রশ্ন করেন সোজা উত্তরও পেতে চান।

তা হলে এই আশ্চর্য ভালোবাসা কখন আসছে? জিওফ্রে গিবসন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে আপনি ভুল অনুমান করেছেন।

আশা করি আমার ধারণাই ঠিক। আমি উত্তর দিলাম, এখন থেকে এক বছরের মধ্যে এমন ভাবে ভালোবাসায় মেতে উঠবেন যে এর আগে তেমন করে কেউ কাউকে ভালোবাসেন নি।

কিন্তু আপনি বলছেন ভালোবাসা আমার জীবনে সুখের হবে না। অথচ গল্পের বইতে লেখা আছে, ভালোবাসা জীবনের সব চেয়ে বড়ো উপহার। আমি কি নিজেকে হারিয়ে ফেলব?

আমি একথা বলিনি, ভালোবাসা আপনার জীবনে সুখ আনবে না। আমি উত্তর দিলাম, উলটো করে বলতে গেলে, ভালোবাসা আপনার জীবনে এমন সুখ আনবে—যখন সেই ভালোবাসা হারাবেন তখন আর বাঁচতে ইচ্ছে করবে না।

জিওফ্রে গিবসন হাসলেন, তা হলে এই অবস্থায় আমি আশা করছি আপনি অবশ্যই ভবিষ্যদ্বাণী করবেন না, আমার জীবনটা খুব দীর্ঘ হবে। জজ জুরিদের কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংক্ষেপে বলে—হাজতে থাকা আসামীকে তাড়াতাড়ি বিচারের রায় শোনান।

আমি জানতাম, আমি তাকে যাই বলি না কেন সে কিছুই বিশ্বাস করবে না; তাই অল্প কথায় তাকে অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলাম : এক বছরের মধ্যে দূর বিদেশে আপনার বিয়ে হবে। গভীর সুখে কাটবে সেই বছরটা। তারপর স্ত্রীর মৃত্যু। কয়েক মাসের মধ্যে আপনারও।

আমাকে লিখে নিতে দিন। জিওফ্রে গিবসন দেঁতো-হাসি হাসলেন, এমন একটা মজার কথা বললেন! মনে রাখতে পারলে হয়, এর সঙ্গে আরেকটু বলতে দিন, আজ রাতে আমার ক্লাবে আধ ডজন লোক আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। কী মজার ব্যাপার, আপনি বলছেন, দূর দেশে বিয়ে! হয়তো আপনার কৌতূহল জাগতে পারে তাই বলছি, আজ সকালে ওয়র অফিস থেকে এই চিঠিটা পেয়েছি। তিনি সরকারি অফিসে ব্যবহার করে এমন একখানা কাগজ টেবিলের ওপর রাখলেন। আমাকে ভারতবর্ষে ভালো রকম একটা চাকরি দেবার জন্যে ডেকেছে। আমার কৌতূহল জাগিয়েছেন কাজেই আমি কাজটা নেব।

তবে আপনার জিঘাংসা স্পৃহার সঙ্গে আপনার সিদ্ধান্তের কোন সম্পর্ক নেই তো? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

জিওফ্রে গিবসন উত্তর দিলেন, সম্ভবত আছে। আর এটা কিন্তু আমার জীবন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারটার সঙ্গে মেলে না। বিশ্বাস করুন বিয়েটা এ ব্যাপারে আসেই না।

প্রায় এক বছর বাদে ক্যাপ্টেন জিওফ্রে গিবসন এক চিঠি পাঠালেন। তার সংক্ষিপ্তসার এই রকম : অসাধারণ ব্যাপার ঘটে গেছে। কয়েক মাস আগে মাদ্রাজ রেসিডেন্সীতে আমার একই বয়সের একটি ইংরেজ

মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। আমরা দুজনেই সামারসেটের লোক। সে ভারতবর্ষে এমনি বেড়াতে এসেছে—আর এসেছে বাঘ শিকার করতে।

ব্যাপারটা হল প্রথম দর্শনে প্রেম—এমন ভালোবাসা যে থাকতে পারে আমি কল্পনাও করিনি। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা বিয়েটা সেরে ফেলেছি আর সত্যিই সুখি হয়েছি!

একদিন সে আমার কিট ব্যাগে আমার লেখা আপনার ভবিষ্যদ্বানী দেখতে পায়ঃ দূর বিদেশে বিয়ে, এক বছর নিবিড় সুখ, তারপর স্ত্রীর মৃত্যু, কয়েক মাস পরে আপনারও মৃত্যু।

আমার স্ত্রীর আপনার ভবিষ্যদ্বানীতে সন্দেহাতীত বিশ্বাস। সে মনে করে আপনি নিশ্চয়ই ছেলে হবার সময় তার মৃত্যুর কথা বলেছেন। ঈশ্বরের দিবি, আপনি আমাকে লিখে জানান যে তার ধারণা সত্যি কিনা। এটা আমাদের দুজনের ধারণা, জন্মের সময়টা ঠিক জানা থাকলে এমন করকোষ্ঠী করা যায় যা থেকে জানা যেতে পারে, একজন লোকের কি ভাবে মৃত্যু হবে।

এ ক্ষেত্রে এমন কোন চিহ্ন ছিল না যা দেখে বলা যেতে পারে বিপদটা প্রসবের দিক থেকে আসবে।

জবাবে আমি লিখলাম, আপনার স্ত্রীকে বলবেন, এ রকম ধারণার কোন ভিত্তি নেই। বিপদটা কোন জন্তু বিশেষ করে সাপের কাছ থেকে আসতে পারে। সম্ভবত আপনার জিবাংসাই এর কারণ হতে পারে। এক বছর বন্দুক ছোঁড়া বন্ধ রাখুন।

এক বছরের বেশি সময় তাদের কাছ থেকে কোন সাড়া পেলাম না। তারপর একদিন একটা লোক কাঁপতে-কাঁপতে আমার লণ্ডনের বাড়িতে এলেন। তাকে জিওফ্রে গিবসন বলে চিনতে বেশ বেগ পেতে হল। কান্নার মাঝে-মাঝে তিনি আমাকে এই গল্পটা বলেছিলেনঃ

আমার চিঠি তাদের বদলাতে পারেনি। মাসের পর মাস তাদের ভালোবাসা বেড়ে চলেছিল যতোদিন না তাদের সম্পূর্ণভাবে মোহগ্রস্থ করে ফেলেছিল।

হায় বন্ধু! সেই নিবিড় সুখের দিন ইতিমধ্যে শেষ হয়ে এসেছিল। জিওফ্রে গিবসন ফোঁপাতে থাকেন, আপনার সতর্ক করে দেওয়ার কথা মনে রাখিনি। প্রাণী হত্যার স্পৃহাও আমি সংযত করিনি। হায় ঈশ্বর, এখন বুঝতে পারছি, পারলে, আমার স্ত্রী হয়তো বেঁচে থাকত।

জাতে ইংরেজ হওয়াতে আমার স্ত্রীও আমার মতো খেলাধুলো ভালোবাসত। সব রকম শিকারেই সে আমার সঙ্গে যেত—কয়েকটা বাঘও সে নিজে শিকার করেছিল। আর কোন জন্তুকেই সে ভয়-ডর করত না—কেবল আমার মতো সাপ দেখে সে আতঙ্কিত হত!

একবার বাঘ শিকার করতে দাক্ষিণাত্যের এক রাজার প্রাসাদে সপ্তাখানেক ছিলাম। একদিন সকালে বেড়াতে বেরিয়ে তুটো অস্বাভাবিক রকমের বড়ো কেউটে জাতের সাপ দেখলাম। সাপ তুটো পাথরের একটা ধাপের ওপর রোদ পোয়াচ্ছিল। তারা পূর্ণ দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত হয়ে জড়াজড়ি করে ছিল—দেখে মনে হচ্ছিল, তারা ঘুমুচ্ছে। আমার সঙ্গে সাধারণ একটা ডব্‌ল্ ব্যারেল রাইফেল ছাড়া অন্য কিছু ছিল না—হামাগুড়ি দিয়ে যতোখানি সম্ভব এগিয়ে গেলাম প্রথমে সামনেরটাকে গুলি করব তারপর দ্বিতীয়টাকে।

যেই আমি লক্ষ্য স্থির করলাম অমনি একটা সাপ মাথা তুলে আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাল। আমি গুলি করলাম। গুলিটা তুই চোখের মাঝে গিয়ে আঘাত করল—আর সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে গড়িয়ে পড়ল আর মারা গেল।

এবার অন্যটার দিকে তাকালাম সেটা আরো বড়ো ইতিমধ্যে ঘাসের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অত্যন্ত আনন্দিত হলাম; এ পর্যন্ত যে-সব সাপ শিকার করেছিলাম এটাই ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। সাপটার গলায় একটা ফাঁস জড়িয়ে টেনে রাজপ্রাসাদে আমাদের থাকবার অংশের বারান্দায় নিয়ে রাখলাম।

রাজামশাই ও আমার স্ত্রীকে বললাম, কি ভাবে সাপ তুটোকে আমি ঘুমন্ত অবস্থায় একসঙ্গে দেখেছিলাম।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, রাজাবাহাদুর সাপের দেহটা দেখেশুনে আতঙ্কিত হয়ে হাতটা সরিয়ে নিলেন।

বন্ধু। তিনি বললেন, আপনি দারুণ খারাপ একটা কাজ করে ফেলেছেন। সঙ্গম ঋতুতে একটা গোখরো সাপকে হত্যা করেছেন। পুরুষ সাপটা প্রতিহিংসা না নেওয়া পর্যন্ত দিন-রাত আপনাকে অনুসরণ করবে।

আমি হাসলাম, বাজে কথা—এ সব কুসংস্কার—ভারতবর্ষে এমন গল্পে অনেক শোনা যায়।

আমার স্ত্রী কিন্তু হাসেনি তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত-কাঁপছিল। সে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, রাজাবাহাদুর বোধহয় ঠিকই বলেছেন জিওফ্রে। দোহাই তোমার, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই—চল যতো তাড়াতাড়ি পারি বোম্বে ফিরে যাই—

রাজাবাহাদুরও ভারি গলায় বললেন, আর প্রথম যে জাহাজ পাবেন তাতেই দেশে ফিরে যান। একমাত্র সমুদ্রই আপনাকে সাপের প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা করতে পারে।

বৃথাই যুক্তি-তর্ক মেলে দিলাম আর রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়তে লাগলাম। বৃথাই আমি রাজাবাহাদুরকে মিনতি করলাম, তিনি একবার বলুন এসব কুসংস্কার ; কিন্তু তিনি কেবল মাথা নাড়তে লাগলেন। পরে চাকরদের ডেকে বললেন, সাপের দেহটা সরিয়ে নাও—

আমরা ছিলাম বোম্বে থেকে দু'শ মাইল দূরে।

সূর্যাস্তের মধ্যেই আমাদের দীর্ঘযাত্রা শুরু হল। যেমন রাত ঘনিয়ে আসতে লাগল আমার স্ত্রীর মানসিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠতে লাগল। তার ধারনা হয়েছিল, সাপটা আমাদের অনুসরণ করে আসছে। যখনি ট্রেন কোন স্টেশনে থামছিল আমার স্ত্রী আতঙ্কে বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল।

অত্যন্ত ক্লান্ত শরীরে অনেক রাতে আমরা বোম্বে পৌঁছে গাড়ি করে হোটেলে গিয়ে উঠলাম। আমি এটা আগে থেকে হোটেল ঠিক করে ছিলাম, কেননা আমার স্ত্রী গাছপালা অত্যন্ত ভালোবাসেন। আর

আমি স্থির করেছিলাম আমার স্ত্রীর সামাজিক শান্তি এবং স্নায়ুকে বিশ্রাম দিতে আমার ক্ষমতায় যদ্দূর কুলোবে করব।

যদি কেউ বলত, আমার স্ত্রীর মতো স্বাস্থ্যবতী খেলাধুলোয় পারদর্শী কোন ইংরেজ মেয়ে সাপ সম্পর্কে মিথ্যে একটা ভাবনায় ভেঙে পড়েছে তাহলে তাকে অবশ্যই পাগল বলতাম। কিন্তু এখন এমন একটা ব্যাপারের মুখোমুখি হয়ে তার সব ব্যাপারে আমার মন তাল রেখে চলবার জন্যে তৈরি হল।

ভগবান জানেন তাকে আমি কতো ভালোবাসতাম। তার স্নায়ু বিকলতা যতো বাড়তে লাগল আমি নিজেকে ততো দোষ দিতে লাগলাম। আপনার যে কথাগুলো লিখে আমার পকেটে রেখে দিয়েছিলাম তাই দিন-রাত আমাকে তাড়া করে ফিরতে লাগল—'এক বছর নিবিড় সুখশান্তি' আর তারপর—!!

তার দুশ্চিন্তা ছিল আমাকে নিয়ে—একবারও সে নিজের কথা ভাবেনি। আমি বৃথাই তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম,যদিও সাপটা আমাদের অনুসরণ করে তবু দু'শ মাইল আসতে অনেক সময় লেগে যাবে।

যাই হোক একটার পর একটা ঝামেলায় আমাদের যাওয়া পিছিয়ে যেতে লাগল। আগামী তিন সপ্তাহের জাহাজের সমস্ত বার্থ রিজার্ভ হয়ে গেছে।

কয়েক দিনের মধ্যে আমার স্ত্রী দেরী হওয়াটা মেনে নিল।

হোটেলের ম্যানেজার সব শুনে হেসে আর বাঁচে না। বলল, আপনাদের ঘরের বারান্দায় বেজি পাহারা দিচ্ছে,সাপ যতো বড়ো হোক না কেন এলেই মেরে ফেলবে।

সব চেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল, সেও একটা বেজি পুষল। আর রাত্রে চুপিসাড়ে উঠে বারান্দায় গিয়ে দেখত বেজিগুলো পাহারা দিচ্ছে কিনা।

এই ভাবে দিন কাটছিল। যাই হোক তিন সপ্তাহ শেষ হবার আগে ইংলণ্ড যাচ্ছে এমন একটা জাহাজের বার্থ পেয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী এমন সুখি হল টিকিট দেখে যে সেগুলো পিন দিয়ে তার মাথার কাছে দেয়ালে লাগিয়ে রাখল।

শেষ কালে, মাল-পত্তর বাঁধা-ছাঁদা করে ক্লান্ত হয়ে খুশি হলাম দেখে, আমার স্ত্রী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

মাঝরাত্তির পার হয়ে গেল, তবু আমি ভাবলাম তাকে একলা রেখে আমি পাশের ঘরে যেতে পারি না।

হে ভগবান, যদি আমরা সহজাত অনুভূতিকে মেনে চলতাম তাহলে হয়তো অনেক বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষে পেতাম।

আমার বুদ্ধিতে মনে হল, এই তো আর বারো ঘণ্টার মধ্যে আমরা দুজন জাহাজে উঠব—আর শুরু হবে গৃহনাবে ফেরার রমনীয় প্রহর। অনুভূতি আর পূর্বাভাস কানে-কানে ফিসফিস করছিল, ঘড়ির প্রত্যেকটা টিক্‌টিক্‌ শব্দের সঙ্গে ভয়ঙ্কর এক নিয়তি ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে।

এসব সত্ত্বেও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে ঘরের অন্যপ্রান্তে কোচের ওপর গা এলিয়ে দিলাম আর ঘুমিয়ে পড়লাম। এ রকম না করলে হয়তো ব্যাপারটা অন্য রকম হত। সম্ভবত আমার মন আমার অনুভব হয়তো জানালার তারের জালির ভেতর দিয়ে সাপের গলে আসার খুট্‌-খাট্‌ শব্দ শুনে থাকবে।

ভোর হয়ে আসছিল।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। বুঝতে পারছিলাম, কিছু একটা গোল-মাল হয়ে গেছে; কিন্তু সেই হতবুদ্ধিকর অবস্থা থেকে জেগে উঠতে পারছিলাম না।

বেশ একটু আলো হলে আমি স্ত্রীর বিছানার দিকে তাকালাম—শিশুর মতো শান্ত হয়ে সে ঘুমুচ্ছিল।

আমি উঠে বসে দেখতে লাগলাম, পর্দার ভিতর দিয়ে সকালের-আলো ঘরের ছায়াকে সরিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ আমার হতভম্ব ভাবের মধ্যে আমি গাঢ় একটা ছায়া দেখলাম তাড়াতাড়ি বালিশের গা বেয়ে তার মুখের দিকে এগিয়ে গেল।

অত্যন্ত দেরি হয়ে গেছিল আমার, সাপটা ইতিমধ্যে ছোবল দিয়েছিল। আমার রক্ত বুঝি জমে গেল। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলাম।

আমার স্ত্রী বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে আমার বুকের উপর এসে পড়ল।

ইতিমধ্যে যা হবার তাই হয়ে গেছিল। অত্যন্ত দেরি হয়ে গেছিল। বিষ-দাঁত দুচোখের মাঝখানে গভীর ভাবে বসে গেছিল। এ সব ক্ষেত্রে আশা করবার কিছু থাকে না। বিষ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যেতে লাগল। আর যে মহিলাকে জীবনে সবচেয়ে ভালোবাসতাম তার ঠোঁট দুটো গভীর আবেগে আমার ঠোঁটে চেপে ধরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

এই গল্পটাই জিওফ্রে গিবসনের মুখে শুনেছিলাম।

গিবসন তার স্ত্রীর মৃতদেহ ইংলণ্ডে নিয়ে এসেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে গেলেও জিওফ্রে গিবসনের কাছে কখনো ডাক আসে নি। মেডিক্যাল ইউনিট তাকে খারিজ করে দেবার মাস কয়েক পরেই তিনি মারা যান।

সমারসেটের শান্ত সমাহিত ছোট্ট সমাধিভূমিতে তার স্ত্রীর সমাধির পাশেই তাকে সমাহিত করা হয়।

যেখানে তাদের জন্ম হয়েছিল, যেখানে তারা বড়ো হয়ে উঠেছিল সেই রৌদ্রালোকিত ও পুষ্পিত দেশের মাটিতে তারা চিরকালের মতো ঘুমিয়ে রইল!

হীরে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সজীব বস্তু অথবা কেউ একে তাদের অলৌকিক শক্তিও বলতে পারেন। ইতিহাস বিখ্যাত এমন হীরে পৃথিবীতে খুব কম আছে যার সঙ্গে ভাগ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী জড়িয়ে নেই।

আমার জীবনে বিভিন্ন গূঢ়-বিদ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন কতকগুলো ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি যাতে হীরে-মুক্তো পৃথিবীর নানা স্থানে ভাগ্য বিবর্তনের রহস্যময় ঘটনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। উদাহরণ হিসেবে 'হোপ ডায়মণ্ডে'র কথা ধরা যাক।

লর্ড ফ্রান্সিস হোপের সঙ্গে লণ্ডন ও প্যারিসে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মিলিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

তার সঙ্গে আমার প্রথম যখন দেখা হয় তখন তিনি শহরের ফুর্তিবাজ যুবক। সেকালে সবাই অন্তত তাকে তাই জানত। হাত দেখাবার জন্যে তিনি একবার আমার কাছে এসেছিলেন। যেমন আর দশজন সেই মধ্য-ভিক্টোরিয় যুগে আমার কাছে আসত।

তিনি ছিলেন ধনী এবং প্রাণ-চঞ্চল আনন্দে পূর্ণ। তখন সারা পৃথিবীটা যেন তার পায়ের তলায়; তবু তার হাতের রেখায় দেখা যাচ্ছিল কয়েক বছরের মধ্যেই দুর্ভাগ্যের পাল্লায় পড়বেন আর যা কিছু করবেন সবই ভুলের বেসাতি হবে।

আমার এই নিদারুণ ভবিষ্যদ্বানী তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, আচ্ছা কিরো বলুন তো, আপনি কি বিশ্বাস করেন এমন কিছু মুল্যবান পাথর আছে যা মানুষের দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে আসে?

নিশ্চিত ভাবে করি। আমি উত্তর দিলাম, এটা নির্ভর করে কি ধরনের ঘটনার ভিতর দিয়ে সেগুলো এসেছে। যদি তাদের অশুভ সংযোগ থাকে, আমার বিশ্বাস অশুভ শক্তি তাদের জড়িয়ে থাকে। কিন্তু আপনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

এই কারণে। তিনি বললেন, আমি লর্ড ফ্রান্সিস হোপ উত্তরাধিকার সূত্রে ব্লু ডায়মণ্ড পেয়েছি। আপনি সম্ভবত এর বিষয় শুনে থাকবেন।

আমার অজ্ঞতা স্বীকার করতে হল।

তিনি বললেন, দারুণ দুর্ভাগ্যের ইতিহাস এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

লর্ড হোপের গল্পটা এই ঃ

হীরেটা হিন্দুদের একটা মন্দির থেকে চুরি করা হয়েছিল। তখনিই অভিশাপ লেগেছিল ঃ যার কাছে এটা থাকবে তাকে দুর্ভাগ্যে পড়তে হবে আর হীরেটা যতোদিন থাকবে অভিশাপও ততোদিন থাকবে। অবশ্য মালিক যদি হীরেটা মন্দিরে ফিরিয়ে দেয় তবে আলাদা কথা।

১৬৬৮ সালে তখনকার মালিক বিখ্যাত ভ্রমণকারী জঁ। তাবার্নিয়ার ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইকে এই হীরেটা বিক্রি করেছিলেন।

ফরাসী রাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর হীরেটা হল্যাণ্ডের মণিকার ফলস্-এর হাতে পড়ে।

এই মণিকার হীরেটার আকার পালটাতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কাজটা করবার আগে তার ছেলে হীরেটা হাতিয়ে নেয়। ফলে বাবার বিষয় সম্পত্তি বেহাত হয়ে গেল আর ছেলেও আত্মহত্যা করল।

হীরেটা পরে ইলিসন বলে একজনের হাতে গেল। কয়েক মাস পরে তিনি আত্মঘাতী হলেন। আত্মঘাতী হবার আগে তিনি ইংলণ্ডের ডীপডেনের টমাস হোপের কাছে বিক্রি করে যান। তারপর থেকে এর নাম হয় হোপ ডায়মণ্ড।

টমাস হোপের হাত থেকে হীরেটা পেলহ্যাম-ক্লিনটন পরিবারের হাতে চলে যায় তারপর তার উত্তর পুরুষের হাত থেকে আমার হাতে আসে।

আপনি তো ইতিহাস শুনলেন কিরো, এখন আপনি কি করতে বলেন ? লর্ড হোপ তার বক্তব্য শেষ করলেন।

যতো শীঘ্রি পারেন এর হাত থেকে মুক্তি নিন। আমি তক্ষুণি উত্তর দিলাম।

লর্ড হোপ হীরেটা হাতছাড়া করেন নি। কয়েক বছর পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, হীরেটা বোধহয় আমাকে আঁকড়ে ধরেছে।

একদিন রাত্রে প্যারিসে এ ব্যাপারে আমার কথা বলার অল্প কয়েক দিন পরে একটা বন্দুক দুর্ঘটনায় তার বাঁ-পা উড়ে যায়। তার পরের দুর্ভাগ্য-টুকু হল, তিনি আমেরিকান অভিনেত্রী ইয়োহীকে বিয়ে করেছিলেন।

আমি প্রায়ই দেখতাম মহিলা ব্লু ডায়মণ্ড পরেন। স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি তিনি দু'হাতে ওড়াতে থাকেন। ভদ্রলোক শেষে ১৯০২ সালে তাকে ডাইভোর্স করতে বাধ্য হন। কয়েক বছর পরে এই মহিলা নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে মারা যান।

১৯০৮ সালে একজন জুয়েলার হীরেটা প্রিন্স কামটোভস্কিকে বিক্রি করেন। তিনি আবার সেটা সুন্দরী ফরাসী অভিনেত্রী লা দিউকে উপহার দেন।

ফরাসী অভিনেত্রী যে রাত্রে সেটা ফলিয়োগ বার্গারির স্টেজে প্রথম পরেন সেই রাত্রে প্রিন্স তার নিজের ঘরে মহিলাকে হত্যা করেন এবং হীরেটা নিজের জিম্মায় রাখেন। কয়েকদিন বাদে একটা লোক হীরেটা চুরি করতে গিয়ে ছুরির আঘাতে প্রিন্সকে হত্যা করে।

এরপর একজন গ্রীক বণিক সেটা কেনেন।

কিছুকাল পরে একদল দস্যু তার কাছে হীরেটা আছে সন্দেহ করে তাকে, তার স্ত্রী আর দুই ছেলেকে হত্যা করে।

তিনি কিন্তু হীরেটা তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সুলতান তারপর থেকে এমন কতকগুলো আকস্মিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলেন যার পরিণামে তাকে তার সিংহাসন হারাতে হয়েছিল।

আরো অনেকের ভাগ্য পরিবর্তন করে প্যারিসে প্রকাশ্য নিলামে হীরেটার দাম উঠল বিশ হাজার পাউণ্ড।

তারপর হীরেটা কিনলেন ওয়াশিংটনের খবরের কাগজের ধনাঢ্য মালিক মিস্টার এডওয়ার্ড ম্যাকলীন, তার সুন্দরী স্ত্রী ইভলীন ওয়াল্‌শ্‌কে উপহার দেবেন বলে। এই ভদ্রমহিলা ছিলেন মন্টানায় খনি ব্যবসায়ে কোটিপতি মিস্টার টমাস, ঈ, ওয়াল্‌শ্‌-এর মেয়ে।

বাবার মৃত্যুর পর মিসেস ম্যাকলীন দশ মিলিয়ন পাউণ্ডেরও বেশি টাকা পেয়েছিলেন কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ অর্থও তাকে হীরের অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষে করতে পারে নি।

ম্যাকলীনদের একটাই মাত্র ছেলে হয়েছিল আর ছেলেটা ইউনাইটেড স্টেটসের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিল। সব রকম সতর্কতা সত্ত্বেও তার আট মাস বয়সের সময় তাকে অপহরণ করবার চেষ্টা করা হয়েছিল আর সে চেষ্টা প্রায় সফলও হয়েছিল।

এই সময় থেকে তার সম্পর্কে দ্বিগুণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল —তাকে কখনো বাড়ির চারপাশের ঘেরা-চৌহদ্দির বাইরে যেতে দেওয়া হত না—শুধুমাত্র শক্তিশালী ইস্পাতের খাঁচা দিয়ে ঘেরা প্যারাম্বুলেটরে চড়ে ভিতরে বেড়াত! মানুষের পক্ষে যতো রকম সতর্কতা সম্ভব তা' থাকা সত্ত্বেও আট বছরের ছোট্ট ভিনসেণ্ট ওয়াল্‌শ ম্যাকলীন একদিন দুপুরে রাস্তায় যাবার দরজা খোলা পেয়ে একছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল আর পথচলতি মোটরের ধাক্কায় মারাত্মক ভাবে আহত হল। তার মা তার কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই সে মারা গেল।

এখনও বিশ্বাস করা হয়, 'ব্লু হোপ ডায়মণ্ড' তার হেপাজতেই আছে কিন্তু সেটা নিউ ইয়র্কের মাটির নিচে স্টীল ভল্টে রয়েছে।

হালফিল মিসেস ম্যাকলীনের দুর্ভাগ্য আবার শুরু হয়েছে। লিণ্ডবার্গ শিশুকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় তিনি গ্যাসটন মীনস্‌কে বৃথা কুড়ি হাজার পাউণ্ড দিয়েছিলেন। লোকটা তাকে ধোঁকা দিয়েছিল যে শিশুটিকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে সে কথা সে জানে। যদিও লোকটাকে শেষকালে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয় বটে কিন্তু টাকাটা আর উদ্ধার করা যায় নি।

বুদ্ধের চোখ

এবার আসছে অসাধারণ হীরে 'দ্য আই অব বুদ্ধ' যার সর্বনাশা ইতিহাস আমাকে বার্লিনে বিখ্যাত হের জুনক্লেহর্ন বলে ছিলেন।

এই হীরেটা সিংহলের একটি বুদ্ধ মূর্তি থেকে একজন ফরাসী সৈনিক চুরি করেছিল; একজন পুরোহিত বাধা দিতে এলে সে তাকে আঘাত করে ফেলে দিয়েছিল। সেই মুমূর্ষু পুরোহিত অভিশাপ দিয়েছিলেন, যার কাছে এই হীরে থাকবে তার সর্বনাশ হবে।

চোর সেই হীরে নিয়ে তুরস্কে গেল আর সেখানে সেটা কিছুদিন সুলতান দীন নুরের পাগড়িতে শোভা পায়।

সুলতানের প্রিয়তমা স্ত্রী হীরেটা পাবার জন্যে তাকে খুন করে এবং পরবর্তী খালিফের সঙ্গে তার সাদি হয়। এই সুখ বেশি দিন তার কপালে টিকল না। একদিন সকালে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। হীরেটা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তুরস্ক থেকে হীরেটা তিব্বতে চলে যায়। একজন কুর্দিশ যোদ্ধা দলাই লামার পটেলা প্রাসাদ থেকে সেটা চুরি করে নিয়ে যায়।

অবশেষে বহু নির্দয় হত্যার রক্ত গায়ে মেখে হীরেটা ভারতবর্ষে গিয়ে হাজির হল। ভারতবর্ষ থেকে আমস্টারডাম্। সেখানে একজন ইহুদী জহরত ব্যবসায়ীকে একজন ব্যবসায়ী বেঁচে দেয়।

জার্মানীর ভেতর দিয়ে যাবার সময় ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

হীরেটা রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হল আর রাজামশাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ইহুদী বণিককে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে হীরেটা আত্মসাত করে ফেলেন।

ইহুদী ফাঁসির মঞ্চে যেতে-যেতে হীরেটা যাদের হেপাজতে রইল তাদের উদ্দেশ্যে নতুন করে সর্বনাশা অভিশাপ উচ্চারণ করল: এই বংশের ভবিষ্যত কোন রাজা, যার জিম্মায় হীরেটা থাকবে বারো সপ্তাহের বেশি রাজত্ব করতে পারবে না; আর তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে মাথায় অভিশাপের বোঝা নিয়ে নির্বাসনে মারা যেতে হবে।

সকলেই জানেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। প্রাক্তন কাইজারের পিতা মাত্তর বারো সপ্তাহের স্বল্পকালের রাজত্ব

করেছিলেন আর কাইজার নিজে মহাযুদ্ধের শেষে হল্যাণ্ডে নির্বাসনে কাল যাপন করেন।

হের জুনক্লেহর্ণ যখন আমাকে এই ইতিহাস বলছিলেন, তখন একটা সাবধান বাণীর নকল আমাকে দেখিয়েছিলেন। যখন কাইজার উইলহেলেম রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে বিখ্যাত সেই লোহার শিরস্ত্রান পরতে যাচ্ছিলেন, যাতে তার বাবা সেই সর্বনাশা হীরেটা বসিয়ে ছিলেন সেটা পরবার বিরুদ্ধে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন !

কোহিনুর

বাকি রয়েছে ইংলণ্ডের সেই বিখ্যাত হীরে কোহিনুর, তার অর্থ আলোর পাহাড়। এর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর রকমের এক রাশ অপরাধ !

এটা দিল্লির সম্রাটের এক্তিয়ারে ছিল। পাঞ্জাব রাজ্য অধিকারের সময় হীরেটা ব্রিটিশদের কাছে সমর্পন করা হয়। কোহিনুর ইংলণ্ডে নিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুটে পরানো হয়। অন্যান্য বিশ্ব-বিখ্যাত হীরের মতো এর সঙ্গেও অশুভ জনশ্রুতি ছড়িয়ে আছে, যে এটা ভারতবর্ষের বাইরে নিয়ে যাবে তার সর্বনাশ হবে। ভারতবর্ষের হাজার-হাজার হিন্দু বিশ্বাস করেন, হীরেটা ফেরত না-দিলে ইংলণ্ডেরও ভালো হবে না।

যাদের জীবিকার সঙ্গে জনসংযোগ আছে তাদের প্রায় সকলেরই আজ হোক কাল হোক খ্যাপাটে, হিংসুক, গোঁড়া কিংবা ঈর্ষাতুরদের বিপজ্জনক পাল্লায় পড়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। আমার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি সে ক্ষেত্রে আমার প্রাণটা সাংঘাতিক ভাবে বেঁচে গেছিল।

আমার নিউ ইয়র্কে থাকবার প্রথম দিকে বর্তমানে সুপরিচিত 'ল্যাঙ্গুয়েজ অব দ্য হ্যাণ্ড' বইটাব জন্যে কঠিন পরিশ্রম করছিলাম। সারা দিন মক্কেলদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে সন্ধেবেলায় ডিনার শেষ করে এ কাজ করতে বাধ্য হতাম। কাজেই ছ'টার পর কোন সাক্ষাৎ প্রার্থীর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হতাম না।

কোন এক শনিবার, প্রায় সাড়ে-ন'টার সময় আমার সেক্রেটারী রিসেপসন রুম থেকে এসে বললেন, একজন না-ছোড়-বান্দা গোছের লোককে সব রকমে চেষ্টা করেও হঠাতে পারিনি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বলছে, তার নাকি খুব জরুরী দরকার আপনাকে। সে বলছে, আপনি আপনার নিয়মের ব্যতিক্রম করে তার সঙ্গে দেখা করলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হবে।

ঠিক আছে, সম্ভবত লোকটা কোন বিপদে পড়েছে ; হয়তো আমি তাকে কিছু পরামর্শ দিতে বা সাহায্য করতে পারি। ভিতরে নিয়ে আসুন।

লেখার যে প্রুফটা দেখছিলাম একপাশে সরিয়ে আমার কনসালটিং টেবিলে গিয়ে বসলাম। সেই টেবিলের ওপর তীব্র বৈদ্যুত আলো ছিল।

লোকটা ঢুকল। পোষাক-আষাকে পারিপাট্য আছে। ঘন ছাঁটা

চুল, কপালের ওপর পাক ধরেছে। তার চোখের দৃষ্টি উদ্বিগ্ন আর হাল-চাল কেমন যেন বিভ্রান্ত।

রাত্তিরের গরমের জন্যে আমার কনসালটিং রুমের দরজা খোলাই ছিল। সেটা লক্ষ্য করে লোকটা বলল, সিঁড়ির দিকে যাবার পথ না ? এই একটা কথাই সে বলেছিল।

আমি আমার অভ্যাস মতো যেমনি বাঁ হাত দেখবার জন্যে তুলে নিলাম, ডান-হাত ফাঁকা পেয়ে সে তার কোটের ভিতর চালিয়ে দিল।

আমি কোন কথা বলিনি। আমি ঝুকে পড়ে কাছ থেকে তার বাঁ-হাতের রেখা দেখছিলাম, সেই সময় বিদ্যুত বেগে তার ডান হাত বের করে তীক্ষ্ণাগ্র ছুরি দিয়ে আমার বুকের ওপর সোজাসুজি সাংঘাতিকভাবে বসিয়ে দিল। আঘাত এত জোরে হয়েছিল যে আমি চেয়ার সুদ্ধ উলটে আমার লেখবার টেবিলের ওপর গিয়ে পড়লাম; ছুরিটা গিয়ে আমার ওয়েস্টকোটের পকেটে রাখা ভারী সিগারেট কেসের ভেতর ঢুকে গেছল।

এ কথা বলা দরকার, একটু আগে সিগারেট কেসটা আমাকে বিখ্যাত অপেরা গায়িকা ম্যাডাম নর্ডিকা উপহার দিয়েছিলেন।

এই বর্মটি না-থাকলে এই রকম অব্যর্থ সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে নিশ্চিত ভাবে বাঁচবার ষোলো আনা সম্ভাবনা ছিল না।

আমি ছোট্ট একটা রিভলবার বের করতে চেষ্টা করলাম। রিভলবারটা দিন কয়েক আগে আমার এক মক্কেলকে রাজি করিয়ে তার কাছ থেকে আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম। আমার ভয় হয়েছিল তার আত্মহত্যা করবার প্রবণতা আছে।

রিভলবারটা হাতড়ানোর আগেই দেখলাম ছুরিটা আলোয় আবার ঝলসে উঠল আর পর মুহূর্তেই একটা আঘাত আমার পোষাকের ভিতর ঢুকে বুকের পাশে সরে গেল। লোকটি তার ছোরা টেনে বের করতে চাইল সেই সময় আমি রিভলবার বের করে গুলি ছুঁড়লাম।

রিভলবারের শব্দ তাকে ভয়ানক সন্ত্রস্থ করে ফেলেছিল।

আমার লিখতে যতোটুকু সময় লাগল তার থেকে কম সময়ের মধ্যে

সে অভিশাপ ছুঁড়ে দিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে ফিফ্থ এভিনিউতে গিয়ে পড়ল।

গুলির শব্দে উপরের এ্যাপার্টমেণ্ট থেকে লোক ছুটে এল। এ্যাম্বুলেন্স ডাকা হল। পুলিশও ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল।

আমি বুঝতে পারলাম, হাসপাতালে যাবার মতো সাংঘাতিক ভাবে আহত হইনি; একজন ডাক্তার এসে আহত জায়গায় সেলাই করে দিলেন আর রাতের বেশির ভাগ সময় আমার ওপর নজর রাখলেন।

এই ঘটনা তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। প্রধান-প্রধান কাগজে এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, মহান আমেরিকাবাসীদের সঙ্গে আমার যে নিবিড় সৌহার্দ গড়ে উঠেছিল প্রাপ্ত চিঠির সংখ্যা থেকে সেটা প্রমাণ হয়েছিল।

পুলিশ আক্রমণকারীকে বের করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোন ফল হয় নি; তবে এই ঘটনার কিছু কাল পরে আমি এই রহস্যময় আক্রমণের ঘটনার একেবারে গভীরে গিয়ে পৌঁছেছিলাম।

এক বছর পরে একজন পাদ্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। তিনি এলেন এবং আমাকে রহস্যময় ব্যাপারটা বললেন।

আমি হেসে বললাম, যেই আমাকে ছুরি মেরে থাক না কেন তার সম্পর্কে আমার মনে কোন শত্রুতা নেই। তিনি কথা দিলেন যদি আমি এ ব্যাপারে কিছু না করি তবে রহস্যের পর্দা পরিয়ে দেবেন।

আমি তাকে কথা দিলাম আর তিনি আমাকে এই গল্পটা বললেন: কিছু কাল আগে আপনার একজন তরুণী মক্কেল, যার জীবনের কথা, আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আপনি আশ্চর্যভাবে বলে দিয়েছেন।

আপনি তাকে বলেছিলেন, আঠারো বছর বয়সে আপনি এমন একজন পুরুষের প্রভাবে পড়েছেন যার জন্যে আপনার তিরিশ বছর বয়সের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে।

তার তিরিশ বছর বয়সের একটা সময় থেকে (আপনি মাস পর্যন্ত বলে দিয়েছিলেন।) এই অবৈধ যোগাযোগ ছিঁড়ে ফেলবার সুযোগ পাবে আর যদি সে এই সুযোগ নেয় নতুন করে আবার জীবন সুরু করতে পারবে আর তখন পর্যন্ত ভাঙাচোরা জীবনে বেশ খানিকটা সাফল্য আনতে পারবে।

আপনি যেমন বলেছিলেন, সুযোগও তেমনি এসেছিল; মেয়েটিও সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে মেয়েটি সেই লোকটিকে বলে ফেলেছিল যে সে আপনার উপদেশ মতো কাজ করছে আর পরের সোমবার আপনার সঙ্গে দেখা করে ঠিক করবে কি করবে না-করবে।

বিলুপ্ত-বুদ্ধি লোকটা রাগে অন্ধ হয়ে গেল আর ঠিক করল কিছুতেই আপনার সঙ্গে মেয়েটাকে পরামর্শ নেবার সুযোগ দেবে না। কাজেই, এক শনিবারের সন্ধেবেলা কৃতসংকল্প হয়ে এল, যদি সম্ভব হয় আপনাকে পথ থেকে সরিয়ে দেবে।

এই হল আপনার গল্প—কিন্তু এখনো শেষ হয়নি। সেই লোকটা এখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। সে এখন ধর্মভীরু ক্যাথলিক—তার কাজের জন্যে অনুতাপ এসেছে। যতক্ষণ না জানতে পারছে আপনি তাকে ক্ষমা করেছেন সে বেচারা মরতে পারছে না। তার দূত হয়ে আমি এসেছি আর ঘটনা সম্পর্কে যা সত্য তা আপনাকে বলেছি। আর এও দেখছি আততায়ী সম্পর্কে আপনার কোন বিরূপ মনোভাব নেই। আপনার মনের মধ্যে দ্বিতীয়বার আক্রমণের আশঙ্কা থেকে থাকে তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আধ ঘণ্টা বাদে আমি আর সে ধর্মযাজক লোকটির বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে আমার মুখ থেকে শুনল যে আমি তাকে পরিপূর্ণভাবে এবং নিঃসর্ত ক্ষমা করেছি। আমিও জেনে সন্তুষ্ট হলাম যে লোকটা শান্তিতে মারা গেছিল।

এই ঘটনার উল্লেখযোগ্য দিক হল, সেই মেয়েটি তখন সাফল্যের

দিকে যাচ্ছিল; অল্পকাল পরে অতীব ধনাঢ্য একজনকে বিয়ে করেছিল।

কয়েক বছর পরে একদিন রাত্রে প্যারিসের নামী এক হোটেলে সে আমাকে দেখেছিল। স্বামীর সঙ্গে চলে যেতে-যেতে সে দরজার কাছ থেকে একজন ওয়েটারকে ডেকে পেন্সিলে লিখে একটা বার্তা আমার কাছে পাঠিয়ে ছিল। আমি যখন এই কাহিনীটি লিখছি তার হাতের বিশেষ ধরনের লেখা চিরকুটটি আমার সামনে পড়ে আছে:

আমার জীবনের সুখ ও সাফল্যের জন্যে আপনার কাছে ঋণী। ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

আমার সদ্য প্রকাশিত স্মৃতি-কথায় আমি বলেছি সুন্দরী ব্ল্যাঙ্কি রুজভেল্টের সঙ্গে আমার কি করে পরিচয় ঘটেছিল। এই প্রথম আমি বলব সেই বিয়োগান্ত ঘটনার সত্য বিবরণ যা তার প্রাণনাশের কারণ হয়েছিল।

এটা করতে গিয়ে আমাকে অসাধারণ সব রোমান্সের একটাকে প্রকাশ করতে হবে যা ঘটনাচক্রে ঘটে রঙ-চটা আমাদের একঘেয়ে জীবনে সোনার সুতোয় নক্সা তোলে!

আমার স্মৃতি-কথায় আগেই বলেছি, ব্ল্যাঙ্কি রুজভেল্ট যেন সেই সব অত্যাশ্চর্য জিনিষের কিছু, যা তারার মতো কয়েক শতাব্দীর মধ্যে একবার আমাদের অস্তিত্বের দিগন্তে উদয় হয়।

যখন তার সঙ্গে আমার দেখা সে তখন দুর্লভ গোলাপের ঐশ্বর্য নিয়ে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত।

ব্ল্যাঙ্কির ষোলো বছর বয়সের সময় সে কি ছিল পাঠক-পাঠিকার কল্পনার ওপর ছেড়ে দিলাম।

ব্ল্যাঙ্কি তার যৌবনে, একমাত্র মাত্র মাকে সঙ্গী করে নিউ ইয়র্ক থেকে স্বর্ণ ও সৌভাগ্যের সন্ধানে ইউরোপ যাত্রা করেছিল।

অপেরা গায়িকা হিসেবে জীবন শুরু করার জন্যে সে মিলানে যাচ্ছিল কণ্ঠের উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে।

ভাগ্য তার জন্যে জাহাজে আমেরিকান কোটিপতি মেজর আলেকজাণ্ডার ডেভিসের সঙ্গে পরিচিত হবার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ভদ্রলোক ১৮৬১-৬৫র গৃহযুদ্ধের সময় টাকার পাহাড় জমিয়ে তুলে ছিলেন। যুদ্ধের শুরুতে আমেরিকার সমস্ত কয়লা মজুদ করেছিলেন আর এই একটা-মাত্তর ব্যবসায়িক লেনদেন সারা জীবনে করতে পেরেছিলেন। যুদ্ধের শেষে দেখলেন, তিনি কোটিপতি হয়ে গেছেন।

তবে সেই সময় থেকে আর নতুন কোন ব্যবসা শুরু করার আত্মাম্মতি করেন নি।

তিনি বিবাহিত ছিলেন; তার দুটি মেয়ে আর অসুখী ধরনের ভার্যা ছিল।

ইতালির রাজার নেপলসের সাগর কিনারের সুরম্য প্রাসাদ ভিলা লা ফ্লোরাডিয়ানা কিনে নিয়েছিলেন। সেখানে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বাস করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

যেসব উল্লেখযোগ্য লোকের সঙ্গে আমার এ পর্যন্ত পরিচয় হয়েছে, আমার মনে হয়, মেজর ডেভিস তাদের মধ্যে একজন। আমি বিশ্বাস করি, তিনি যা কামনা করতেন তাই পেতে পারতেন কিন্তু রাজনীতিকে তিনি ঘৃণা করতেন, ব্যবসাকে অবিশ্বাস করতেন। তিনি আমার পরিচিত শিল্পীদের মতো শিল্প ও সৌন্দর্য ভালোবাসতেন। মূল্যবান পাথরের তিনি ছিলেন বিখ্যাত সংগ্রাহক, হীরের দামের চেয়েও তার অসাধারণ বর্ণ বৈচিত্র্যই তাকে বেশি আকর্ষণ করত। অনেক সন্ধ্যাই তার সঙ্গে আমার কেটেছে তার বিভিন্ন আধারে রাখা একটার পর একটা মণি মুক্তোর সংগ্রহ দেখে এবং কখন কোথায় কি ভাবে এগুলো সংগ্রহ করেছেন তার ইতিহাস শুনে।

মিস্টার ডেভিস যাচ্ছিলেন তার নেপলসের নিভৃত বাসভবনে: সেই জাহাজে ব্ল্যাঙ্কি রুজভেল্টের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সম্ভবত তার অসাধারণ সৌন্দর্যই তাকে আকর্ষণ করেছিল। ব্ল্যাঙ্কি যদি মূল্যবান মণিমুক্তো হত মিস্টার ডেভিস নিঃসন্দেহে সংগ্রহের জন্যে তাকে কিনে নিতেন; কিন্তু মেয়েটি সবে উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী তায় সঙ্গে তার সেকেলে ধরনের মা। তা ছাড়া তিনি নিজেও বিবাহিত সুতরাং কোন রকম কেনাকাটা একেবারেই সম্ভব ছিল না।

জাহাজ সাউদাম্পটনে পৌঁছল। যাত্রীরা যে-যার নিজের গন্তব্যে যাবার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। মেজর ডেভিস যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন, এই সুন্দরী মেয়েটির ভাগ্যে একাকী সুদূর ইউরোপে নানা রকম বিপদ-আপদ ঘটতে পারে তাই তিনি একখানা কার্ড তার দিকে এগিয়ে

দিলেন। তাতে লেখা ছিলঃ কোন বিপদে পড়লে জানিও আমি সাহায্য করব।

মেজর ডেভিস গেলেন নেপলস আর ব্ল্যাঙ্কি মিলানে।

ব্ল্যাঙ্কির বয়েস আঠারো হতে-না-হতে তার রূপে তার মধুর কণ্ঠের গুণগানে শহর মুখর হয়ে উঠল। জুলিয়েত হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ প্রাচীরপত্রে অপেরা হাউসের গায় লটকে দেওয়া হল আর উদ্বোধনের দিন প্রত্যেকটা আসন বিক্রি হয়ে গেল।

সেদিন দুপুরে ইতালির জনা ছয়েক যুবককে মিলানের জকি ক্লাবে জুয়ো খেলতে দেখা গেল।

প্রিন্স ম্যারো ডি কলোন্না সেই রাত্রে জুলিয়েতের ভূমিকায় সুন্দরী ব্ল্যাঙ্কি রুজভেল্টের সফলতা কামনা করে পানোৎসবের আয়োজন করেছিল।

কাউন্ট ম্যাচেণ্ডা ব্ল্যাঙ্কির সঙ্গে রোমিও হিসেবে নিজের সাফল্য কামনা করে পান পাত্র তুলে ধরল।

কথার পিঠে কথা চলে। শেষে কাউন্ট হাজার লিরা বাজি রাখল, ব্ল্যাঙ্কি অপেরা থেকে ফেরবার পর, সে তার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে জুতো ফেলে দিয়ে প্রমাণ করবে ব্ল্যাঙ্কি তার প্রণয়িনী।

ব্ল্যাঙ্কির আবির্ভাব যেন জয়োল্লাসে ফেটে পড়ল, তার অমিত লাবণ্য ললিত কণ্ঠস্বর রূপোর ঘণ্টার মতো বেজে উঠল। পুষ্প বিহ্বলতায় আচ্ছাদিত তার অতিন্দ্রিয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ দর্শকেরা তার গাড়ি থেকে ঘোড়া সরিয়ে রাণীর মতো তাকে হোটেলে টেনে নিয়ে ছিল।

মাঝরাত্তির এল। পথ ঘাট নির্জনতায় ডুবে গেল। ব্ল্যাঙ্কির শোবার ঘরে একটার পর একটা আলো নিভে এল। তার গর্বিতা জননী তার ক্লান্ত ঠোঁটে শেষ চুমু দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেলেন।

তারপরই তার জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটে গেল। বাইরে পাথরের ঝুল বারান্দায় কাউন্ট ম্যাচেণ্ডা কয়েক ঘণ্টা লুকিয়ে ছিল;

এইবার উঠে, ব্ল্যাঙ্কির ঘরে লুকিয়ে থাকার ভান করে ঘরের জানালা দিয়ে ক্লাবের বন্ধুদের কাছে রাস্তায় বুট ছুঁড়ে ফেলে দিল তারপর নিচে নেমে তাদের কাছে গিয়ে বাজির টাকা দাবী করল।

পরের দিন সকালে এই গল্পটা লোকের মুখে-মুখে সারা শহরে চাউর হয়ে গেল। কেচ্ছাটা এমন আকার নিল যে কাউন্ট ম্যাচেণ্ডা ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছেয় হোক ব্ল্যাঙ্কিকে বিয়ে করে তাকে কাউন্টেস ম্যাচেণ্ডা করতে বাধ্য হল। তবে ব্ল্যাঙ্কির অপেরা জীবনের দফারফা হয়ে গেল।

তারপর থেকে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ব্ল্যাঙ্কির শোচনীয় রকমের অসুখী বিবাহিত জীবন। যেহেতু বিয়েটা চার্চের সম্মতি ও মিলানের কার্ডিনালের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, একমাত্র মৃত্যু ছাড়া কারো পক্ষে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব ছিল না।

এইজন্যে কেউ মেয়েটিকে দোষ দিতে পারে না যে স্বামীকে পরিত্যাগ করে সে প্যারিস ও লণ্ডনের শিল্পী সমাজে সুখ খুঁজে বেড়িয়েছিল।

ব্ল্যাঙ্কি চিকাগোর অগ্নিকাণ্ডের নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে 'কপার কুইন' নামে যে বইটা লিখেছিল, তা সার্ডন এবং বুলওয়াল লিটনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তাঁরা তাকে সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপারে উৎসাহ জুগিয়ে ছিলেন।

সবই ভালো চলত যদি না মৃত্যু এসে তার মাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। মা ছিলেন তার সমস্ত স্বাভাবিক উদ্দেশ্যের একমাত্র আশ্রয়।

শেষ নোঙরটাও ছিঁড়ে গেল। সংসার সম্পর্কে তার জ্ঞান হয়তো বাচ্চাদের চেয়ে সামান্য একটু বেশি ছিল আর তাই নিয়ে সে স্রোতে গা-ভাসিয়ে এক রাজধানী থেকে অন্য রাজধানীতে ভেসে বেড়াতে লাগল।

সৌন্দর্যই ছিল তার অভিশাপ। ড্রেসমেকাররা তার জন্যে মহার্ঘ পোষাক নির্মানের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল আর জুয়ো খেলার নরক-গুলো তার জন্যে দরজা খুলে দিল। ব্ল্যাঙ্কির দেনার বহর দিনের পর দিন বেড়ে যেতে লাগল।

মেজর ডেভিস কতবার দেনা শোধ করেছেন তা আমার জানবার কোন উপায় নেই। জাহাজে তার সঙ্গে ব্ল্যাঙ্কির দেখা হবার পর থেকে সব সময়ই তিনি নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন তবে যখনি ব্ল্যাঙ্কি বিপদে পড়েছে বলে শুনতে পেয়েছেন তখনি তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছেন।

মেজর ডেভিস ঠিক করে দিলেন যে লণ্ডনই তার বসবাসের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। তার ব্যবস্থাপনায় প্রতি মাসে ব্ল্যাঙ্কিকে একটা মাসোয়ারা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। তবে সর্ত রইল, সে কোন দিন প্যারিস বা মন্টি কার্লো যেতে পারবে না।

এই ব্যবস্থায় প্রথম দু'বছর সব কিছু ভালোই চলল। তার চমৎকার স্যুইটে সুন্দর একটা ঘর করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছিল যেখানে খ্যাত-নামা শিল্পী, লেখক আব গায়কেরা আসতেন এবং তাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়ে যেতেন।

তার জীবনের এই পর্বে তার সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে আমার দেখা হয়েছিল যেটা আমার স্মৃতি কথায় আগেই বলেছি।

একদিন রাত্রে খাবার পর ব্ল্যাঙ্কি আমাকে টেলিফোন করল, কিরো, আমার ইচ্ছে, আপনি আমার সঙ্গে এক ধনাঢ্য আমেরিকান ভদ্রলোকের নৈশ ভোজসভায় হাজির থাকেন। তিনি এই সিজ্‌নে হাইড পার্কের কাছে একটা বাড়ি নিয়েছেন। আপনার সঙ্গে দেখা হলে সব খুলে বলা যাবে।

আমরা যখন গাড়ি চালিয়ে স্যাভয়ের দিকে যাচ্ছিলাম ব্ল্যাঙ্কি তখন আমাকে বলল, যার সঙ্গে আমরা দেখা করতে যাচ্ছি তিনি ইংলণ্ডের উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারী এবং স্যার রিচার্ড মাসগ্রোভের উপাধি পেয়েছেন। সে আরো বলল, ভদ্রলোক অবিবাহিত, অত্যন্ত ধনী এবং উদার। তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল বন্ধুদের আনন্দের জন্যে পার্টি দেওয়া।

ব্ল্যাঙ্কি একনাগাড়ে বলে চলল, মাননীয় স্যার রিচার্ড এই সামাজিক উৎসবে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছেন, আপনার যাকে ভালো লাগে, যতোজনকে ভালো লাগে, সঙ্গে নিয়ে আসুন।

আধঘণ্টার মধ্যে হাইড পার্কের ধারে মার্বেল আর্চের দিকে বিশাল এক ম্যানসন বাড়ির পোর্টিকোর নিচে গিয়ে গাড়ি থামল।

দরজা হাট করে খোলা। আধডজন হাঁটু পর্যন্ত ব্রীচ পরা ধবধবে সাদা পরচুলোয় ঢাকা রক্ষী তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

তারা সম্ভ্রমের সঙ্গে জানালো, স্যার রিচার্ড হলের শেষে লাইব্রেরী ঘরে সকলকে অভ্যর্থনা করছেন।

বৃত্তাকারে ঘিরে রাখা একদল অতিথির ভিতর থেকে স্যার রিচার্ড বেরিয়ে এসে আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন। ভদ্রলোকের চেহারায় স্বাতন্ত্র্য আছে। পরিপাটি কামানো মুখ, চুলগুলো রসুনের মতো সাদা, মুখে বিজয়ীর হাসি আর সদয় অভিব্যক্তি।

তিনি বললেন, মাই ডিয়ার ব্ল্যাঙ্কি আপনাকে আর আপনার বন্ধুকে দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আপনারা এটাকে নিজের বাড়ি বলে মনে করবেন। আমি চাই প্রত্যেকেই আনন্দ উপভোগ করুক, আমার জীবনের একান্ত ইচ্ছে হাসি-খুশি ভরা মুখ আমাকে সারাক্ষণ ঘিরে থাকুক।

তারপর তিনি তার সর্বক্ষণের সঙ্গী এক যুবকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। শক্তিশালী ও সুদৃঢ় তার শরীরের গঠন আর মুখখানা পেশাদার লড়ুইয়ের মতো। সাধারণভাবে তাকে উল্লেখ করলেন জন টেবর বলে।

দু'জনের বৈপরীত্য এতবেশি যে আমি সেদিকে ব্ল্যাঙ্কির দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

সে হেসে বলল, সব আমেরিকান বড়লোকেরাই একটু ছিটগ্রস্থ। যুবকটি সম্ভবত, আমরা স্টেট্‌সে যাকে বলি 'বডিগার্ড'! একে স্যার রিচার্ডের মতো পরোপকারী ব্যক্তির কি দরকার থাকতে পারে আমি বলতে পারছি না!

বারবার ককটেল আর স্যাম্পেন পরিবেশন করা হতে লাগল আর প্রতি মুহূর্তে ক্রমাগত অতিথিরা এসে হাজির হতে লাগলেন।

ধনী আমেরিকানের দেওয়া নৈশ পানভোজনের পার্টি সর্বদাই লণ্ডনের মানুষ-জনকে টানে!

টেবিলে যে সব ভালো জিনিষ দেওয়া হচ্ছিল তা সম্ভ্রান্ত ডাচেচ্‌দের একান্ত প্রিয় সুতরাং তারা দলে-দলে স্যার রিচার্ডের নেমন্তন্ন গ্রহণ করবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

নৈশ পানভোজনের শেষে বদান্য চেহারার গৃহকর্তা উঠে কয়েকটা কথা বললেন। প্রায় ছলছলে চোখে বললেন, ইংলণ্ডে এসে তিনি কি রকম সুখী হয়েছেন আর ইংলণ্ডের উদার মানুষেরা তাকে কি ভাবে একান্ত আপনজন বলে গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের ঔদার্যে এখানে এসে আমাকে ধন্য করেছেন।

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আপনাদের সুখি করার মতো আয়োজন করতে পারিনি। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি গান ভালোবাসেন তবে মিউজিক রুমে যান। সেখানে কনভেণ্ট গার্ডেন থেকে কয়েকজন শিল্পী এসেছেন আপনাদের সামনে গান গাইবেন বলে। হয়তো কেউ তাস খেলতে ভালোবাসেন সে ব্যবস্থাও হয়েছে। অবশ্য আপনারা দুঃখ করবেন না যদি আমি হেরে যাই। চলুন ড্রইং রুমে যাওয়া যাক সেখানে সব কিছু পাবেন; যার যেটা ভালো লাগে সবই সেখানে আছে।

একজন বিবাহ বিচ্ছিন্না ডাচেসকে বাহুলগ্ন করে উপরে উঠে স্যার রিচার্ড জুয়োখেলার প্রশংসা করে বললেন ইংলণ্ডের মহত্বের ভিত নিহিত আছে এই খেলার মেজাজে!

ইতিমধ্যে আমরা যখন দোতলায় সেলুনে গিয়ে পৌছলাম, সকলের মনেই তখন এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে জুয়োখেলাই ব্রিটিশ জাতির সম্মান রক্ষার একমাত্র উপায়।

যখন আমরা ড্রইং রুমে ঢুকলাম,সাদা পরচুলোপরা চাপরাশীরা জুয়ো খেলার টেবিলগুলো সাজিয়ে রাখছে। মনে হবে এসব আমাদের বদান্য গৃহকর্তার হঠাৎ-চিন্তার ফল। দুটো রুলেট টেবিল দু'প্রান্তে, ছোট্ট একটা ট্রেন্তঁ এট্ কোয়ারেন্তঁ টেবিল আর মাঝখানে ব্যাকারাটের সাজ সরঞ্জাম।

দেয়ালে প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা ছবি আর অগ্নিকুণ্ডের ওপর প্রত্যেকটা তাকের ওপর এক কাঠের বৃহদাকার ঢাল, বন্দুক, পিস্তল ও শাণিত ছুরির প্রাচীন স্মারকে সুসজ্জিত।

ব্ল্যাঙ্কি আর আমি একসঙ্গে ব্যাকারাট টেবিলের ধারে গিয়ে বসলাম। জন টেবর ব্যাঙ্কারের স্থান নিল আর এমন ভান করতে লাগল যে জুয়ো খেলা সম্পর্কে তার বিশেষ জ্ঞান নেই।

আমি আমার জীবনে কখনো ব্যাকারাট ধরনের জুয়ো খেলিনি; ব্ল্যাঙ্কি ফিসফিস করে বলল যে সে আমাকে সাহায্য করবে। হয়তো নতুন শুরু করার জন্যে কিংবা ব্ল্যাঙ্কির পরামর্শের ফলে আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দেখলাম শ'খানেক পাউণ্ড জিতে ফেলেছি। তখুনি স্নায়ুকে বিশ্রাম দেবার জন্যে মিউজিক রুমে গিয়ে হাজির হলাম।

রাত তিনটের সময় আমরা যখন অতিথিদের অভ্যর্থনা ঘরে ফিরলাম, তখন জুয়োর টেবিলের সব খেলাই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রত্যেকেই সুখী মনে হল। প্রত্যেক অতিথি কিছু-না-কিছু জিতেছেন শুধু জন টেবর আর আমাদের আমন্ত্রণ কর্তা বাদে। মনে হচ্ছিল তারা মোটা রকমে হেরেছে।

আমি গাড়ি করে ব্ল্যাঙ্কিকে হোটেলে নিয়ে এলাম। তিন শ' পাউণ্ড জিতে সে খুব খোস-মেজাজে ছিল।

ব্যবসায়িক ব্যাপারের জন্যে আমাকে প্রথমে প্যারিস তার পর রাশিয়া যেতে হয়েছিল সুতরাং ব্ল্যাঙ্কির সঙ্গে আমার তিনমাস দেখা হয় নি। আমি লণ্ডনে ফিরতে সে আমাকে অসাধারণ খবর দিল যে স্যার রিচার্ড মাসগ্রোভ তার সঙ্গী বেটি কম্প্‌স্টককে বিয়ে করবেন বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। বেটি কম্প্‌স্টক এমন একজন মহিলা যাকে কেউ বিয়ের কথা চিন্তা করতে পারে না। সে ছিল ছোট্ট খাট্টো দুর্লভ ঠুনকো একটা কিছু যা দমকা বাতাসে আকাশে উড়ে যেতে পারে। সাধারণ মানুষের তাকে দেখে মনে হয়, সে যেন অর্কিড!

বেটি ব্ল্যাঙ্কির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল—ব্ল্যাঙ্কির চিঠির জবাব দিতে, আগে-থেকে-ঠিক-করে-রাখা কাজের জায়গায় হাজির থাকা, ডিনারের ব্যবস্থা করা, বিল মেটান আর ব্ল্যাঙ্কি যখন ঘুমুতে চাইত না তখন তার কাছে সারারাত বসে থাকা—এই সব কাজের জন্যে নিঃস্বার্থ ও মহৎ মানবীটি কোন পয়সা-কড়ি নিত না। কুকুর যেমন তার প্রভুর আজ্ঞাবাহী বেটিও তেমনি ব্ল্যাঙ্কির গভীর অনুরাগী ছিল। তার পুতুলের মতো মুখে গভীর নীল চোখ দুটো ব্ল্যাঙ্কিকে অনুসরণ করত যাতে তার সব ইচ্ছেকেই তামিল করতে পারে।

বেটিকে ছাড়া আপনার চলবে কি করে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। এ ব্যাপারে তো আর আমি স্বার্থপর হতে পারি না। ব্ল্যাঙ্কি জবাব দিল, বেটির এই সুযোগটার কথা ভাবুন তো! তাকে বাচ্চা-মতো দেখায় বটে তবে বয়েসটা তার পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। এর আগে তার জীবনে কোন পুরুষ আসে নি। হঠাৎ এখানে ধনী খেতাব ও অবিবাহিত ভদ্রলোকটি হাজির হওয়াতে এই ব্যাপার ঘটেছে।

আপনি যদি দেখতেন, কি ভাবে তিনি আমাকে মিনতি করেছিলেন তার অভিলাষ পূর্ণ করতে সাহায্য করার জন্যে। দেখে মায়া হয়, কি-ভাবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বেটিকে কেমন যত্ন করবেন আর বিপদ-আপদ থেকে তাকে আড়াল করে রাখবেন। অবশ্য এতে আমি রাজি হয়ে বেটির সঙ্গে কথা বলি—বেটির মনস্থির করতে সময় লাগে যে সে আমাকে ছেড়ে যাবে।

স্যার রিচার্ড সারেতে বাগান দিয়ে ঘেরা ছোট্ট সুন্দর একটা বাড়ি কিনে দিয়েছেন। জায়গাটা লণ্ডন থেকে কুড়ি মাইলও নয় কাজেই তিনি শনিবার থেকে সোমবার তার কাছে যেতে পারবেন। বিয়েটা শিগ্‌গিরী সেখানে হবে। আমরা সবাই যাচ্ছি আপনিও আসবেন।

এক সপ্তাহ বাদে ছোট কব্‌হ্যামের কাউন্টি চার্চে বিয়ে হল। ব্ল্যাঙ্কির সমস্ত বন্ধু ও বান্ধবী এবং স্যার রিচার্ডের ডাচেস খেতাবধারিণী বহুসংখ্যক বান্ধবীরা দল বেঁধে সেখানে গেলেন। বেটিকে ফুলে-ফুলে

ঢেকে দিয়ে অসংখ্য উপহার দেওয়া হল। বোধ করি কোন বিবাহের আরম্ভ এত শুভ হয় নি।

অবশ্য স্যার রিচার্ডের এই পছন্দে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন; যে মানুষ ইচ্ছে করলে লণ্ডনের যে কোন রূপসীর পাণি গ্রহণ করতে পারতেন তিনি এই-রকম-একটা এলেবেলে মেয়েকে বিয়ে করলেন! আমরা ভালোবাসার এই রহস্য ও কুটিল গতির কথা ভাবতে-ভাবতে লণ্ডনে ফিরে এলাম। স্যার রিচার্ড সকলের চোখে এক ধাপ উঁচুতে উঠে গেলেন।

খ্রীষ্টমাস এল।

ব্ল্যাঙ্কির বন্ধু ও বান্ধবীরা তাকে উপহার পাঠানোর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল।

আমি বাড়াবাড়ি করতে চাইলাম না কাজেই তার জন্যে স্বাভাবিকের চেয়ে বড়ো নীল অস্ট্রিচের একটা পাখা বিশেষ ভাবে তৈরি করলাম—নীল রঙটা তার আশ্চর্য নীল চোখের সঙ্গে মানানসই করবার জন্যে।

আমার পছন্দটা ব্ল্যাঙ্কিকে খুশি করেছিল আর সম্ভাব্য সব জায়গায় সে পাখাটা নিয়ে যেত।

হায়রে আমাদের চিন্তার পরিসর কত ছোট! এই পাখাটাই শেষে তার মৃত্যু বয়ে নিয়ে এল!

আবার গ্রীষ্ম এল।

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি স্যার রিচার্ড এক শুক্রবার রাতে সোস্যালের আয়োজন করলেন। লণ্ডন শহরের সেরা মানুষ-জন সেখানে হাজির ছিলেন। ব্ল্যাঙ্কিকে তিনি এক ধনকুবের যুবক ভিক্টর গ্রাণ্টকে সঙ্গে করে আনতে বলেছিলেন। গ্রাণ্টের আর দশটা উড়ন-চণ্ডী অভ্যাসের মধ্যে জুয়ো খেলাও একটা প্রাত্যহিক অভ্যাস!—

ভাগ্য দেবতাই আমাকে সেখানে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে সেই

রাত্রে প্যারিসে পাঠিয়েছিল কিন্তু সেখানে যা ঘটেছিল কয়েকমাস বাদে ব্ল্যাঙ্কির নিজের মুখ থেকে আমি শুনেছিলাম।

এ পর্যন্ত মিস্টার রিচার্ড যে সব সান্ধ্যোৎসবের আয়োজন করেছিলেন এটাই তার মধ্যে জমজমাট এবং আয়োজনে ঢালাও বিলাসী ঝলমল করতে লাগল

দামী অর্কিড ও গোলাপে প্রত্যেকটা ঘর সাজানো, শ্যাম্পেন ও লীকার জলের স্রোতের মতো বয়ে গেল। উপরের তলায় জুয়ো খেলার ঘরে পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা অন্য বারের চেয়ে বেশি।

জুন মাসের উষ্ণ রাত।

হাইড পার্কের দিকে মুখ করা জানালাগুলো হাট করে খোলা।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে যে কেউ দেখতে পাবে অবিশ্রান্ত গতিতে গাড়ি চলেছে ডিনার-অপেরা আর বল থেকে।

লণ্ডন উৎসব মদে মত্তা!

স্যার রিচার্ডের অতিথিরা চওড়া বেস্‌ওয়াটার রোডের ওপারে যদি চোখ ফেলতেন, তাহলে চমকে উঠতেন এই দৃশ্য দেখে যে শাদা পোষাকে আধ ডজন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ভিতরে যে-সব লোকজন এসেছে তাদের ওপর সতর্ক চোখ রেখেছে।

স্যার রিচার্ডের 'সোস্যাল' পার্টির খ্যাতি অনেকদূর ছড়িয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ এসেছেঃ যুবকদের সঙ্গে মহিলাদের দল তাদের কেউ যুবতী কেউ বৃদ্ধা স্যার রিচার্ডের অত্যাশ্চর্যভাবে সাজানো 'সেলুনে' ফি-সপ্তাহে হাজার-হাজার পাউণ্ড হেরে গেছেন।

কি করা যাবে!

ইংরেজদের বাড়ি তার দুর্গ।

কর্তৃপক্ষকে বেআইনী কাজ-কারবার সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল।

সেই স্বাধীনতা-প্রীতির দিনে যে-কোন ভদ্রলোক ইচ্ছে করলে তার বন্ধুদের নিয়ে জুয়ো খেলতে পারতেন।

পুলিশ হয়তো হোয়াইট চ্যাপেলে জুয়োখেলা বরদাস্ত না-করতে

পারে কিন্তু ওয়েস্ট এণ্ডের কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে জুয়ো খেলা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

নীতির প্রশ্নে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যে ফ্যারাক আছে এবং থাকবেও।

মাঝরাত পার হয়ে যাবার পরও জুয়ো খেলা দারুণ তৎপরতার সঙ্গে চলল। বিপুল পরিমাণ অর্থ হাত পালটালো কিন্তু ব্ল্যাঙ্কি সব সময়ই জয়ী হল।

যুবক ভিক্টর গ্রাণ্ট দারুণ মার খেল। প্রথমটা সে কিছু মনে করে-নি প্রত্যেকবার হারবার সঙ্গে-সঙ্গে হেসে উঠেছে।

হঠাৎ যেমনি যে লোকটা জুয়ো খেলার টাকাকড়ি রাখে ও পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দেয় সে বিপুল পরিমাণ টাকা ভিক্টর গ্রাণ্টের কাছ থেকে সরিয়ে ফেলল। ভিক্টর লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে লাগল, আমার সঙ্গে জোচ্চুরি করেছে!

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা আপনারা শুনুন এটা ধান্দাবাজ জোচ্চোর-দের ডেরা ছাড়া অন্য কিছু নয়—আর আমি সেটা প্রমাণ করব।

কথাগুলো সবে তার মুখ থেকে বেরিয়েছে এমন সময় কে যেন দেয়ালের ওপর সাজানো ঢাল থেকে একটা কাট্‌লাস ছুরি নিয়ে হিংস্র ভাবে তেড়ে-ফুঁড়ে তার মাথায় আঘাত করে দু'ভাগ করে ফেলল।

ভিক্টর গ্রাণ্টের আর্তনাদ প্রতিধ্বনি হয়ে জানালা পেরিয়ে যান-বাহনের শব্দ ছাড়িয়ে রাস্তায় ডিটেকটিভদের কানে পৌঁছল।

ভীত-সন্ত্রস্থ অতিথিরা দ্রুত পায় বাড়ির বিপরীত দিকের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পথে নেমে বাঁচল।

এটা ভদ্রলোকের বাড়ি এ কথা স্মরণ করে পুলিশকে এতক্ষণ ভদ্র-লোকের মতো আচরণ করতে হল—এবার পার্কের দিককার দরজায় তারা মৃদু ধাক্কা দিল।

কোন উত্তর এল না—তারা প্রচণ্ডভাবে দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করল কিন্তু দরজা এতটুকুও নড়ল না। শেষে লোহার পাত সরিয়ে বল্টু খুলে ভিতরে ঢুকল তারা।

সমস্ত ঘর ও সিঁড়িতে আলো জ্বলছিল।

পুলিশ ভিতরে ঢুকে দেখল, বাড়ি ফাঁকা একটা চাকর-বাকরেরও স্থলুক-সন্ধান পাওয়া গেল না।

গরাদ-বিহীন বিশাল জানালাওলা সেলুনের দিকে ছুটে গেল তারা—এইখান থেকে হৃদয়-বিদারক আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। ঘরে ঢুকে তারা দেখল ব্যারাকাট টেবিলে আড়াআড়ি ভাবে ভিক্টর গ্রাণ্টের প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে—তখনো তার খুলিতে কাটলাস ছুরি খানা বিদ্ধ হয়ে আছে।

সেই দীর্ঘ নির্জন ঘরে একটা জিনিষই শুধু নড়ছিল সেটা চমৎকার একটা নীল রঙের অষ্ট্রিক পালখের পাখা—হয়তো কোন মহিলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়বার আগে ফেলে গেছেন।

ভোরের দিকে ব্ল্যাঙ্কি প্যারিস চলে গেল।

সকাল ছ'টা।

বেটি ঘুম থেকে উঠে তার কবহ্যামের ছোট্ট কটেজের মধ্যেই ছিল।

গরমের দিনে ইংলণ্ডে কেউ বিছানায় থাকতে পারে না কেননা সময় পাখির কলকাকলিতে মুখর। ফুলের গন্ধ চুপি-সাড়ে জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। বিশেষ করে সে দিনটা ছিল আবার শনিবার।

বেটি আশা করছে, আজ দিনের যে-কোন সময় স্যার রিচার্ড ফিরে আসবেন।

তার বিস্ময় এবং আনন্দ কল্পনা করুন, যখন সে তার বাগানের পথে একটা ট্যাক্সি থামবার শব্দ পেল!

স্যার রিচার্ড গাড়ি থেকে বেরিয়ে ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিলেন তারপর ঠেলে দরজা খুললেন। তার পরনে সান্ধ্য পোষাক মাথায় কোন টুপি নেই!

তার কি কোন অসুখ করেছে যে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল!

বেটি তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে গেল।

না, তিনি বেটিকে আশ্বস্ত করলেন, তার কোন অসুখ করেনি। বেটি সম্পর্কে হঠাৎ এমন চিন্তা হল যে রাত্রে ঘুমুতে পারেন নি তাই তাকে চমকে দিতে ছুটে এসেছেন আর—পরনে সেই সান্ধ্য পোষাকই রয়ে গেছে।

তাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল যে বেটি বলল, আমি যতোক্ষণ ব্রেকফাস্ট করি তুমি ঘুমিয়ে নাও।

আপত্তির কিছু নেই। স্যার রিচার্ড পাতলা আইরিশ লিনেন জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বাজার করবার ছোট্ট একটা বাস্কেট নিয়ে বেটি কাছাকাছি একটা দোকানে গেল। সে জানত, খাঁটি আমেরিকানদের মতো তার স্বামী ব্রেকফাস্টের জন্যে ডিম আর শুয়োরের মাংস সবচেয়ে ভালোবাসে।

ফেরবার পথে সে প্রায় বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেছিল এমন সময় হাতে টুপি নিয়ে সুবেশ একজন ভদ্রলোক তার দিকে এগিয়ে এলেন। লেডী মাসগ্রোভ। তিনি বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন আপনা-কে একটা অত্যন্ত জরুরি কথা বলা প্রয়োজন।

আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইনসপেকটর রিচার্ডস। আপনার স্বামীর নামে একটা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আমার পকেটে আছে।

বেটির নিষ্পাপ-নীল চোখ স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ বড়ো হয়ে গেল। সে কেবল কাঁপতে লাগল কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না।

তারপর যা ঘটল, আমার বিশ্বাস, কল্পনায়ও তার তুলনা মেলা ভার!

ইনসপেক্টর রিচার্ডস হাত দিয়ে বেটির পড়ে যাওয়া ঠেকিয়ে আবেগ জড়ানো দয়ার্দ্র গলায় বললেন, লেডী মাসগ্রোভ আপনি যখন ব্ল্যাঙ্কি রুজভেল্টের সহচরী ছিলেন তখন অনেক উপলক্ষ্যে আপনার কাছাকাছি গেছি। সেই ভদ্রমহিলার প্রতি বছরের পরবছর আপনার নিঃস্বার্থ সেবার আমি প্রশংসা করেছি।

আপনি আমাকে চেনেন না; স্যার রিচার্ড মাসগ্রোভের সঙ্গে যখন আপনার বিয়ে হয় সেই বিবাহোৎসবে যোগ দিতে আমি কবহ্যামে এসেছিলাম।

স্যার রিচার্ডের আমেরিকার ইতিহাস জেনে বুঝতে পেরেছিলাম তাকে আজ হোক কাল হোক গ্রেপ্তার করা হবে। এই বিশ্বাসে আমি এতদিন অপেক্ষা করছিলাম এমন সুযোগ একদিন আসবে যেদিন আপনাকে সাহায্য করে আমার শ্রদ্ধার প্রমাণ রাখতে পারব।

কাল রাতে সুযোগটা এল যখন আপনার স্বামীর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আমার হাতে দেওয়া হল।

যদি আপনার বাড়িতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে হয়তো আপনাকেও সন্দেহের পাল্লায় পড়তে হবে আর কেউ বলতে পারে না সেই জটিলতা কোথায় গিয়ে শেষ হবে।

আমি যা চাই তা হচ্ছে এই, প্রথমে আপনি একলা গিয়ে ব্যাপারটা সামলান। আপনার স্বামীকে ব্রেকফাস্ট দিন—এতোখানি পথ আসবার পর এটা তার দরকার। তারপর তাকে শান্তভাবে বলুন, তুমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইনসপেক্টর মিস্টার রিচার্ডসের সঙ্গে দেখা কর। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আর তার পকেটে তোমার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রয়েছে। তবে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি এটা বেলা বারোটার আগে ব্যবহার করবেন না যাতে তুমি পিছনের দরজা দিয়ে সরে যেতে পারো।

যা বললাম ঠিক তাই করুন। ভাগ্যের পর বিশ্বাস রাখুন এই ভাগ্যেই আমাকে আপনার প্রতি সহৃদয় হতে বাধ্য করেছে। যদিও এটা আমার পক্ষে দুর্ভাগ্যের তবু আমি তাই করব।

বেটি ব্রেকফাস্ট তৈরি করল। যখন কেটলীর জল ফুটছিল তখন সে উপরে গিয়ে স্যার রিচার্ডের জন্যে ট্রাভেলিং স্যুট বের করল।

বেচারা চোখের জল রাখতে পারল না, যখন দেখল তার স্বামী অত্যন্ত উপাদেয় শুয়োরের মাংসের টুকরোর স্বাদ উপভোগ করছে। এরপর সে আর ইংলণ্ডে ফিরবে না।

এরপর বেটি তাকে ব্যাপারটা খুলে বলল।

স্যার রিচার্ড মাসগ্রোভের মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

তিনি বুঝলেন, তার খেলা শেষ হয়ে গেছে কেননা বেটি মিথ্যে কথা বলতে পারে না।

তারপর সেই মুহূর্ত এল যখন একজন নির্মম অপরাধীকেও বেদনায় বিধুর হতে হয়। স্যার রিচার্ডের চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। পুলিশের 'ওয়ান্টেড্' লোকটি অনুভব করল, তার জীবনে গভীর যে ভালোবাসা এসেছে তাকে বেশিদূর বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। বিচারের কাছ থেকে পলাতক আসামীর কোন সঙ্গী থাকে না!

অল্পই কথা বললেন স্যার রিচার্ড। দুহাতের মধ্যে বেটিকে জড়িয়ে ধরলেন আর তার অব্যক্ত-অশ্রুত কথা বুকের স্পন্দনে ধ্বনিত হতে লাগল: সে অপরাধী হতে পারে কিন্তু বেটি হচ্ছে সেই নারী জীবনে যাকে সে ভালোবেসেছে!

পুরুষের সত্যিকারের ভালোবাসা নারীর জীবনে পরম সান্ত্বনা। আর এই রকম ভালোবাসার মুহূর্তে মান-ইজ্জত এমন কি জীবনেরও ঝুঁকি নিতে পারে!

বেটি স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। জল-ভরা চোখে সে হাসল। বোধহয় তার নীল চোখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছিল। যাই হোক সে সাহস দেখাল, স্বামীকেও পিছনের দরজায় নিয়ে গেল আর যে লোকটাকে সে ভালোবাসে তাকে চিরকালের মতো বিদায় জানাল।

স্যার রিচার্ড মাসগ্রোভ নিউ ইয়র্কে নামতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হল। নিউ ইয়র্ক পুলিশের কাছে তার বিরুদ্ধে তিনটি হুলিয়া ছিল প্রথম হল দীর্ঘদিন ধরে প্রতারনা চালানো, দ্বিতীয়ত ডাক-গাড়িতে ডাকাতি করে কয়েক মিলিয়ন টাকা হাতানো আর শেষ অভিযোগ হল, তাসের জালিয়াতি। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হল আর দশ বছর পরে সিংসিং জেলে মারা যান।

এবার ব্ল্যাঙ্কির কথায় আসা যাক।

সে নিরাপদে প্যারিসে পৌঁছেছিল। তার স্নায়ু এত বিকল হয়ে গেছিল যে সে প্যারিসে গিয়েই অসৎ প্রমোদে ডুব দিল।

মন্টি কার্লোতেও সে গেছিল যদি সেখানে জুয়োখেলে পাওনাদারদের বকেয়া কিছু টাকা তুলে আনতে পারে। ইতিমধ্যে ভাগ্য তাকে পরিত্যাগ করেছিল অন্তত কিছু দিনের জন্যে ; সেখানে তাকে লজ্জা ও দেউলে হবার মুখোমুখি হতে হল কিন্তু আবার মেজর ডেভিস এসে তাকে উদ্ধার করলেন।

এইবার মেজর ডেভিস কঠোর মনোভাব নিলেন। ব্ল্যাঙ্কি আর কখনো মন্টি কার্লোতে যেতে পারবে না। তিনি লণ্ডনের পোর্টম্যান স্কোয়ার থেকে সরে একটা রাস্তায় চমৎকার বাড়ি নিলেন আর মেপল এ্যাণ্ড কোম্পানীকে পূর্ণ দায়িত্ব দিলেন তারা ব্ল্যাঙ্কির ইচ্ছে মতো আসবাবপত্তর দিয়ে সাজিয়ে দেবে।

ব্ল্যাঙ্কির সত্যি রুচিবোধ ছিল—তার আঙুলের ছোঁয়ায় শিল্পীর নৈপুণ্য ছিল।

প্রথম পাতার ওপর আটকে গেল। সেখানে বড়ো অক্ষরে সংবাদের শিরোনাম ছিল।

'দ্য কাটলাস কেস'

'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড অবশেষে অস্ট্রিচ পাখার মালিককে খুঁজে পেয়েছে।'

ব্ল্যাঙ্কি এর বেশি পড়ে নি। সে যেন সব শক্তি হারিয়ে ডিভানের ওপর পড়ে গেল এর পর থেকে সে ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল— তারপর আর সুস্থ হয়ে ওঠেনি।

যদি আমার পাঠক-পাঠিকারা এই বিয়োগান্ত কাহিনীর আদ্যোপান্ত পড়ে থাকেন তবে তাদের অনুরোধ করব তারা যেন তাদের অবসর সময় একবার লণ্ডনের দক্ষিণ-পূর্ব ব্রোম্প্টন রোডের শেষে ব্রোম্প্টন সমাধিক্ষেত্রে যান।

সেণ্ট্রাল এভিনিউ ধরে হেঁটে গেলে শুভ্র ক্যারারা মর্মর দিয়ে তৈরি ব্ল্যাঙ্কি রুজভেল্টের পূর্ণাবয়ব মূর্তির সামনে পৌঁছে যাবেন।

ব্ল্যাঙ্কির স্মৃতিতে মেজর আলেকজাণ্ডার ডেভিস এটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

জীবন্ত যীশু

এখন আমি একজন মানুষ আর একটা ছবির কাহিনী বলব। কাহিনীটা অদ্ভুত। একথা বলাই বোধহয় ঠিক যে এমন ঘটনা শুধু সেই দেশেই ঘটতে পারে যে দেশটার নাম আমেরিকা।

দীর্ঘ দেহ ও সুশ্রী চেহারার একজন যুবক এসে একদিন দুপুরের দিকে আমার সঙ্গে দেখা করল। কথাবার্তায় সে খোলামেলা। বলল, আপনাকে দেবার মতো পয়সা আমার নেই।

কে বিশ্বাস করবে যে তার হাত এমন করে আমায় আকৃষ্ট করবে। স্বীকার করতেই হবে, তাই করেছিল। তার সবল হাত দুটো চেষ্টাসাধ্য যে-কোন কাজে সক্ষম। অদ্ভুত সেই হাত দুটোতে শিল্পী-জনোচিত প্রবণতা আকীর্ণ রেখায় সুস্পষ্ট।

যুবকটি ছেলেবেলা থেকেই তার হাতের কাছে যে-কাজ পেয়েছে তাই দিয়ে সৎ পথে রোজগার করে মা-বাবাকে সাহায্য করেছে।

দশ বছর বয়সের সময় শিল্পী যখন ক্যানভাস কিনতে পারেনি তখন কাঠের ওপর ছবি খোদাই করেছে। কুড়ি বছর বয়েসের সময় হুডসন নদীর ধারে নিউ জার্সিতে নির্জন অরণ্যের মধ্যে একটা স্টুডিও খুলে বসল। তারপর তার ছবি বিক্রি করা শুরু হল। শেষে মস্ত এক ক্যানভাস কিনে ঠিক করল তার ওপরে অনেকদিন ধরে মনে-মনে ঠিক করে রাখা ছবি আঁকবে।

আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। বিষয়টা কী?

অন্য কিছু নয়। যীশু খ্রীষ্ট। যুবকের যা স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা ছিল। বরং আমাদের বলা উচিত, যদি সে চেষ্টা করে স্বয়ং যীশু কি-করে-কি-করতে-হবে তা শিখিয়ে দেবেন।

সে যেমন নিজেই নিজের স্টুডিও তৈরি করেছিল ছবি আঁকার

রঙও নিজেই মিলিয়ে মিলিয়ে তৈরি করে নিল। জীবনে সে ছবি আঁকা সম্পর্কে কোন শিক্ষা পায় নি; তা ছাড়া সে এত গরীব ছিল যে পৃথিবী ঘুরে শিল্পীদের আঁকা যীশুর ছবি দেখবে এমন কোন উপায়ও তার ছিল না। তবে তার বিশ্বাস ছিল। গভীর মহৎ সৃষ্টির জন্যে তৎপর হয়ে সে কাজ শুরু করে দিল।

যুবকটি নিউ জার্সির নির্জন অরণ্যে বসে যে দুঃসহ অবস্থায় স্বআরোপিত কর্তব্য পালনে এগিয়ে এসেছিল তার চেয়ে রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত ছবি আঁকার ইতিহাসে আমার জানা নেই।

অবশেষে ছবিটা শেষ হল। ইজেলের গায় কুড়ি ফুট দীর্ঘ যীশু স্টুডিওর একপ্রান্তে খাড়া হয়ে রইল। অদ্ভুত তার পটভূমিকা, রক্ত-বেগুনী-নীল-সন্ধ্যায় ঘনিয়ে আসা অন্ধকার ও দিনের মাঝখানে গোধূলি আকাশে তারা ফুটে ওঠবার প্রথম মুহূর্তের বিস্তার! কয়েক মাস ধরে এই যুবক তার আঁকা যীশুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল আর সেই চোখ থেকে তার জীবন দর্শন খুঁজে পেল বুঝি! এই সময়টা তার না-খেয়েই কেটে গেল।

একদিন এক দারুণ ঝড়ের রাত। অরণ্যের অন্ধকার স্টুডিও ল্যাম্পের চারপাশে হামলে পড়ে ভয়ঙ্কর রকমের গাঢ় হয়ে এসেছে। সেই সময় স্টুডিওর দরজায় করাঘাত শোনা গেল। একবার। দু'বার। তিনবার।

যার কাছে কেউ কখনো আসেনি তার পক্ষে বিমূঢ় বা আশ্চর্য হবার পক্ষে যথেষ্ট। তবে আশ্চর্য হবার চেয়েও বেশি কিছু ছিল। দরজা খুলতেই ডোরাকাটা পোষাক-পরা জেল-পালানো দুই আসামী তাকে ভিতরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

খাবার-দাবার কিছু দাও। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো তারা এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠল যেন লাফিয়ে পড়ে তার টুটি চেপে ধরবে।

খাবার মতো কিছু ছিল না এমন কি রুটির টুকরো-টাকরাও নয়। খাবার নেই, একথা বললে কি হত বলা কঠিন—যদি-না সেই সময়

বেপরোয়া ক্ষুধার্ত মানুষ দুজনের চোখ দাঁড়িয়ে থাকা জীবন্ত যীশুর প্রতিমূর্তির দিকে চোখ পড়ত!

পর মুহূর্তে লোক দুটো ছবির সামনে নতজানু হয়ে বসল।

ভিতরের নিঃশব্দ নির্জনতার সঙ্গে বাইরের বাতাসের গোঙানি মিশে যাচ্ছিল।

যীশু সম্ভবত তাদের বৃত্তান্ত ও ক্ষমা প্রার্থনার কথা শুনেছিলেন।

হঠাৎ দরজার কাছে দৃঢ় পায়ের শব্দ শোনা গেল তারপরই দারুণ করাঘাত।

পুলিশ যখন ঘরে ঢুকল শিল্পী একা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আসামী দুজন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পুলিশ অফিসার বললেন, আজ রাতে দুজন দাগী আসামী জেল ভেঙে পালিয়েছে। আলো দেখে ভাবলাম তারা বোধহয় ভেতরে ঢুকেছে

কৌতূহলবশতঃ যীশুর ছবির দিকে নজর পড়ল করুণাঘন চোখে।

তিনি বললেন, না, আসামীদের পাবার মতো জায়গা এটা নয়। আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। এখানে নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। শুভরাত্রি!

সব ব্যাপার যখন মিটে গেল আসামী দু'জন হামাগুড়ি দিয়ে ছবির পিছন থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটু পেতে যীশুর সামনে বসে প্রতিজ্ঞা করল, অপরাধের জীবন পরিত্যাগ করে তার মহান আদর্শ অনুসরণ করবার চেষ্টা করবে।

এই লোক দুজন এখনো জীবিত। তারা আর তাদের পুরনো জীবনে ফিরে যায় নি। অন্য কোন দেশে যীশুর আদর্শের জন্যে তারা যথার্থ মানবোচিত কাজ করে চলেছে।